হুচ্

একটি সমন্বিত প্রয়াস

৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা আগস্ট ২০১৪

হুচ্

সম্পাদক

আলোড়ন খীসা

প্রকাশকাল

আগস্ট ২০১৪

মুদ্রণ

পুনশ্চ, ২৭৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট

কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০।

যোগাযোগ

সেল ফোন : ০১৬৭০ ৭০১২০৯, ই-মেইল : alokhisa@gmail.com

www.chtbd.org

মূল্য

১০০.০০

সূচিপত্র

পাহাড়ের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহসহ বিভিন্ন বিষয় এবং আইনের কিছু দিক : অজল দেওয়ান ৫
চাকমা কিংবদন্তী : কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা ১৬
ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত ও বৃহৎ নৃ-গোষ্ঠীর আগ্রাসন : সম্প্রীতি চাকমা ১৯
হোচ্পানার কর্ণফুলী গেল মুরি (কর্ণফুলীর মৃত্যু) : অজল দেওয়ান ৩৬
নিকোলাই চাক্মা'র কবিতা ৪৬
একটি বনের কাহিনী : প্রশান্ত ত্রিপুরা ৪৭
কিপটে ঠিকাদার ও দুই জনদরদী : অডং চাকমা ৫০
আত্মহত্যা : হরি কিশোর চাক্মা ৫৫
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি গল্প : কুঙ্গ থাঙ ৫৮
জুম ঘর ও পূর্ণিমা : তন্দ্রা চাকমা ৬২
দুই আঙুলের চিঠি : অডং চাকমা ৬৫
জুম পাহাড়ের গল্প : অমিত হিল ৬৮
একটি চাকমা গল্প : উৎপল খীসা ৭১
শিক্ষা, মানবাধিকার ও বিশ্বশান্তির জন্য নিবেদিতপ্রাণ এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ৭৮
তিলিপের সন্ধানে : স্মরণিকা চাক্মা ১০৪
ওমর খৈয়ামর রুবাইয়াৎ : সুগত চাকমা ননাধন ১০৯
কবিত্ব : এডিট দেওয়ান ১১৬
নোবেলজয়ীদের কবিতা ১২০
পাঠক প্রতিক্রিয়া : চেতনার এনজিওকরণ ১২৩

পাহাড়ের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহসহ বিভিন্ন বিষয় এবং আইনের কিছু দিক

অজল দেওয়ান

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম এবং ফেইসবুকের সূত্র ধরে প্রায় সবাই অবগত আছেন যে গত ১০ জুন খাগড়াছড়ির দিঘীনালা উপজেলার বাবুছড়া এলাকায় যত্ন মোহন কার্বারি পাড়ায় বন্দোবস্তী জায়গায় কলাগাছ রোপণ করাকে কেন্দ্র করে বিজিবি-পুলিশ-সেটেলার মিলে পাহাড়ি নারীদের উপর হামলা চালায় এবং কমপক্ষে ২৩ জন আহত হন। আহতদের মধ্যে ৫ জনকে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে এবং ১৪ জনকে দিঘীনালা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। ঘটনার দুইদিন পর সামরিক হস্তক্ষেপে ১৪ জনের মধ্যে ১০ জনকে রিলিজ করে দেয়া হয় যদিও তাঁরা সে অবস্থায় ছিলেন না। পরবর্তীতে আহতরা বাবুছড়া হাইস্কুলে আশ্রয় নেয়। বর্তমানে সেখানে প্রায় ২১ টি পরিবার রয়েছে। বিজিবি'র দখলকৃত এলাকাটি প্রায় ৪৪ একর যার মধ্যে ২৯.৮১ একর বন্দোবস্ত জমি। গ্রামবাসীরা এই জমির জন্য নিয়মিত খাজনাও প্রদান করেন। এখানে রয়েছে ২১টি পরিবারের ভিটেবাড়ি ও তাঁদের আয়ের একমাত্র অবলম্বন কৃষিজমি। প্রতিটি বাড়িতেই রয়েছে ধানের গোলা, সহায় সম্পত্তি ও গবাদি পশু। কিন্তু তাঁরা সেসব নিয়ে আসার অনুমিত পাচ্ছেন না। বাড়িতে প্রবেশ করতে চাইলে বিজিবি সদস্যরা বাঁধা দিচ্ছে। ফলে, রাষ্ট্রীয় এই আগ্রাসনে অসহায় পরিবারগুলো বর্তমানে মানবেতন জীবনযাপন করছে। প্রতিটি পরিবারেই রয়েছে গ্রেফতার আতঙ্ক, কারণ বিজিবি ৪০ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ১৫০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। এ পর্যন্ত ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ, একজন ১৬ বছরের কিশোরী, বাকিরা ৫-৬০ বয়োবৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলা। তবে বর্তমানে ৩ জনকে জামিন দেয়া হয়েছে। গত ২৮ জুন খাগড়াছড়ির নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যানদের সাথে জেলার আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক এক বৈঠকে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাসুদ করিম স্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছেন, বাবুছড়ায় উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলোকে এক পয়সাও ত্রাণ দিতে পারবেন না। তিনি বরং অভিযোগ করেছেন একটি মহল জনগণকে বিজিবি'র বিরুদ্ধে উস্কে দিচ্ছে। বাবুছড়ায় ৫১ নং ব্যাটেলিয়ন সদর দপ্তর স্থাপনের জন্য ১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং

জমি অধিগ্রহণ সরকারি নিয়ম কানুন মেনে করা হয়েছে। অপরদিকে, গত ৩ জুলাই ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে দিঘীনালা ভূমি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে দিঘীনালা থেকে বাবুছড়া পর্যন্ত মানববন্ধন কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। কিন্তু হঠাৎ করে তার আগের দিন প্রশাসন দিঘীনালা উপজেলায় ১৪৪ ধারা জারি করে। কারণ হিসেবে বলা হয়, বিজিবি ক্যাম্পের দাবিতে বাঙালি ছাত্র পরিষদ একই সময়ে একই কর্মসূচী ঘোষণা করেছে তাই সংঘর্ষ এড়াতে প্রশাসনের এই উদ্যোগ। পরবর্তীতে হামলায় আহত গোপা চাকমার পক্ষ থেকে ৫১ ব্যাটেলিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল আবুল কালাম আজাদ সহ ৯ জনকে উকিল নোটিশ প্রেরণ করা হয়।

সূত্রপাত

প্রথমে একটু নজরে আসা যাক ঘটনার সূত্রপাত নিয়ে। বিজিবি'র ক্যাম্প দখলের চেষ্টা শুরু হয় সর্বপ্রথম ২০০৫ সালে। তখন ১৯৫৮ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইন অনুসরণ করে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে উক্ত যত্ন মোহন কার্বারি পাড়ার গ্রামবাসীদের নোটিশ পাঠায় বিজিবি কর্তৃপক্ষ। কিন্তু ১১ জন গ্রামবাসী উক্ত নোটিশের বিরুদ্ধে হাইর্কোটে রিট আবেদন পেশ করেন যার মামলা নং ৩৪৫৫/২০০৫। হাইর্কোট নোটিশের বিরুদ্ধে রুল জারি করেন এবং অধিগ্রহণ কার্যক্রমের উপর স্থগিতাদেশ দেন।

এরপর দীর্ঘ ৯ বছর পর আবার গত ১০ এপ্রিল জেলা প্রশাসক জমি অধিগ্রহণের জন্য গ্রামবাসীদের নোটিশ প্রেরণ করে। হাইর্কোটে বিষয়টি রিট আবেদন থাকায় তারা গ্রাহ্য করেননি। গত ১৪ মে রাতের আঁধারে বিজিবি সদস্যরা ৪৪ একর জায়গা দখল করে নেয় এবং ২১টি পরিবারকে বের করে দেয়। সেস্থানে অবস্থিত ২নং বাঘাইছড়ি সরকারি প্রাইমারি, সেটিকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেয় বিজিবি এবং সেখানে তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করতে শুরু করে। জেলা প্রশাসন কর্তৃক বিজিবি'কে জমি দেয়া হয়েছিল বাবুছড়া ইউনিয়নে কিন্তু বর্তমানে যে স্থানে তারা ক্যাম্প স্থাপন করছে তা দিঘীনালা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। দখলের পরদিনই ইউএনও বিজিবি কর্তৃপক্ষকে উক্ত জমি হস্তান্তর করেন। এর প্রতিবাদে সেখানে গড়ে ওঠে দিঘীনালা ভূমি রক্ষা কমিটি। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই কমিটি রাজপথে তার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। কমিটির পক্ষ থেকে গত ৩১ মে একটি লিফলেটও প্রকাশ করা হয় এবং কেন বিরোধীতা করা হচ্ছে সে প্রসঙ্গেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এরপর ঘটে বিজিবি-পুলিশ-সেটেলার কর্তৃক গ্রামবাসীদের উপর হামলা।

চলমান ঘটনা এবং বাঙালি ছাত্র পরিষদসহ সেটেলারদের আন্দোলনে সংশ্লিষ্টতা

ঘটনার শুরু থেকেই এটি ছিল নিরীহ পাহাড়িদের জমি দখলের বিরুদ্ধে আন্দোলন। কিন্তু ৩ জুলাইয়ের কর্মসূচী বানচাল করতে বাঙালি ছাত্র পরিষদ যোগ দিলো কেন?

এখানে প্রশাসনের একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। গত ৩ জুলাই সিএইচটি কমিশন বাবুছড়ায় ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান এবং একই সাথে বাঘাইছড়িতে যান। এখানে উল্লেখ্য যে, বাঘাইছড়ি বিহার স্থাপন নিয়ে আর্মি ও পুলিশ প্রশাসন সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করে রেখেছিল এবং এর প্রতিবাদে জনতা ২৮৮ ধারা জারি করে এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য সড়ক অবরোধের ডাক দেয়। একই সাথে রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবান পরিদর্শনে যাওয়ার কথা কমিশনের। কমিশনের এই সফরকে কেন্দ্র করে বাঙালি ছাত্র পরিষদ, সমঅধিকার আন্দোলনসহ ৬টি সংগঠন রাঙ্গামাটিতে ৪ ও ৫ জুন সড়ক ও নৌ পথ অবরোধের ডাক দেয়। একই সাথে বান্দরবানেও ৪ দিনের অবরোধ ঘোষণা করে তারা। তবুও কমিশন রাঙ্গামাটি সফরে যায় এবং সেখান থেকে ফেরার পথে সমঅধিকার আন্দোলনসহ ৬টি সংগঠনের নেতা-কর্মীদের হামলার শিকার হয়। ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে তারা কমিশনের সদস্য বহনকারী গাড়ির কাঁচ ভেঙে দেয় এবং এতে কমিশনের গবেষক ইলিরা দেওয়ান মাথায় মারাত্মক আঘাত পান। এরপর সমঅধিকার আন্দোলনসহ ৫টি সংগঠনের বিরুদ্ধে দুইটি মামলা দায়ের করা হয়।

পার্বত্য বাঙালি ছাত্র পরিষদ, সমঅধিকার আন্দোলন (দুইটি গ্রুপ-ওয়াদুদপন্থী ও ওয়াদুদবিরোধী), পার্বত্য গণ পরিষদ, সমঅধিকার ছাত্র আন্দোলন, পার্বত্য বাঙালি ছাত্র ঐক্য পরিষদ, পার্বত্য যুব ফ্রন্ট, পার্বত্য নাগরিক পরিষদ এই ৮টি সেটেলার সংগঠন পাহাড়ের রাজনীতির সাথে জড়িয়ে আছে। প্রায় সবকটি সংগঠনই পাহাড়িদের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করেছে। তবে সবচেয়ে সক্রিয় সংগঠন বাঙালি ছাত্র পরিষদ। এ সংগঠনের কর্মকান্ড সবচেয়ে বেশি। যদিও এ সংগঠনে শিবির এবং ননশিবির এই দুই পক্ষ সক্রিয় রয়েছে। শিবিরবিরোধীতার জের ধরে কিছু ছাত্র বাঙালি ছাত্র পরিষদ থেকে দলত্যাগ করে বাঙালি ছাত্র ঐক্য পরিষদ গঠন করে। কিন্তু পাহাড়িদের সাথে বিরোধীতার জেরে প্রতিটি সংগঠনই একাত্মা। এক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করে বাঙালি ছাত্র পরিষদ এবং সমঅধিকার আন্দোলন।

এই দুইটি সংগঠনের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেয়ার অভিযোগও রয়েছে। ২০১০ সালের খাগড়াছড়ি সদরে সংঘর্ষের ঘটনায় ৬টি সংগঠনের নেতা-কর্মীরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। এর ২ বছর পর রাঙ্গামাটি সদরে হামলায়ও বাঙালি ছাত্র পরিষদের কর্মীরা পাহাড়ি মালিকানাধীন দোকান ভাঙচুর ও লুটপাট করেছিল। এছাড়া বিভিন্ন ঘটনায় তারা বরাবরই পাহাড়িদের বিরুদ্ধে কর্মসূচী ঘোষণা করে আসছিল। বান্দরবানের রোয়াংছড়িতে এক মারমা স্কুল শিক্ষিকাকে ধর্ষণ ও হত্যার প্রধান আসামি মোসলেম মিঞাকে গণ-পিটুনিতে হত্যা করে জনতা। এর প্রতিবাদে তারা মানববন্ধন করে এবং পাহাড়িদের মাঝে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক কমিশন (সিএইচটি কমিশন) এর প্রতিটি সফরেই তারা সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ মিছিলসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করেছে। পাহাড়ের ক্রমাগত ধর্ষণের ঘটনাকে তারা তাদের ওয়েবসাইট ও ফেইসবুক পেজগুলো

থেকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করে এবং গত কয়েকমাস আগে সবিতা চাকমার ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় তারা "উপজাতি সন্ত্রাসী"র বিচার চেয়ে মানববন্ধন করে। তাদের দাবি ছিল, এক্ষেত্রে নিরপরাধ সেটেলারটিকে ফাঁসানো হচ্ছে। সমাবেশ-মানববন্ধন শেষে ফেরার পথে তারা পাহাড়ি গ্রামের নিকটবর্তী হয়ে উস্কানিমূলক স্লোগান দেয় এবং সেখানে একটি জাতিগত দাঙ্গা সৃষ্টির সম্ভাবনাও তৈরি হয়। এছাড়াও, মিথ্যা অজুহাতে সাম্প্রদায়িক হামলারও চেষ্টা করা হয়েছে। এ বছরের ৩১ জানুয়ারি আবু তাহের নামে এক সেটেলার মিথ্যা অপহরণের ঘটনা সাজায়। পরবর্তীতে পুলিশের হাতে আটক হওয়ার পর মূল ঘটনা বেরিয়ে আসে। মাত্র ৬০ হাজার টাকার বিনিময়ে এ নাটক সাজানো হয় এবং এর মাধ্যমে খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি-সেটেলার দাঙ্গা বাঁধানোর প্ল্যান করা হয়। ঘটনার মূল হোতা কারা সেটা অজ্ঞাতই রয়ে গেছে কিন্তু অঙ্গুলি নির্দেশ করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর প্রধান শক্তি সমঅধিকারের দিকেই। আর গতবছরের তাইন্দং-এর ঘটনার সবার জানা। সেটেলার মোটরসাইকেল চালক নিখোঁজ হয়েছেন এই মিথ্যা অজুহাত তুলে প্রায় ৩০০০ পাহাড়িকে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে সেটেলাররা। তারা ২০টির মতো বাড়ি পুড়িয়ে দেয় এবং প্রতিটি পাহাড়ি বাড়িগুলোকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। এ ঘটনায় শেষ পর্যন্ত কথিত অপহৃত মোটরসাইকেল চালকই প্রধান আসামি হিসেবে গ্রেফতার হয়।

পাহাড়ের মূল্য সমস্যা : জাতিগত না ভূমি?

পার্বত্য অঞ্চলে মূল সমস্যা নির্ধারণে এখন সামনে নিয়ে আসা হয়েছে জাতিগত সমস্যাকে। আসলে কি তাই? জাতিগত সমস্যা বলতে আমরা বুঝি বিভিন্ন জাতির মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট জটিলতা। কিন্তু পাহাড়ে এ সমস্যা ছিল না, এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে ভূমি দখলকে কেন্দ্র করে। '৮০ পরবর্তী সময়ে যখন জিয়াউর রহমানের সরকার দেশের বিভিন্ন এলাকার ছিন্নমূল বাঙালিদের পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়িদের জমি দখল করে পুনর্বাসন দেয়, তখন থেকেই জটিলতার শুরু। সেসব বাঙালিদের আমরা বলি সেটেলার। আবার যারা চাকরিসূত্রে বা স্বাধীনতা অনেক আগেও পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের বসতি গেড়েছে তাদের বলি স্থায়ী বাঙালি বা আদিবাসী বাঙালি। এই স্থায়ী বা আদিবাসী বাঙালিদের সাথে পাহাড়িদের বিরোধের কথা কখনো শোনা যায় নি। বরং, সহাবস্থানের ঘটনা আমরা দেখতে পাই যার ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধে অনেক পাহাড়ি বাঙালিদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছেন। ১নং সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমান মহালছড়ি হয়ে বিভিন্ন পাকিস্তানী ক্যাম্প আক্রমণ করতেন এবং নদী পারাপার, খাবার সরবরাহ, পথের গাইড প্রভৃতি কাজে পাহাড়িরা সহায়তা করেছিল। জাতিগত সমস্যা যদি মূল সূত্র হিসেবে ধরা হয় তাহলে ইতিহাসে এসব ঘটনা লিপিবদ্ধ হতো না, অনেক পাহাড়ি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পেত না। কিন্তু যখনই সেটেলারদের পুনর্বাসন দেয়া হয় এবং পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার ফলে পাহাড়িরা তাদের জমি হারাতে শুরু করে তখন থেকেই

সেটেলারদের প্রতি, বাঙালিদের প্রতি পাহাড়িদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে শুরু করে।

এরপর বিভিন্ন দাঙ্গা, গণহত্যায় সেটেলারদের অংশগ্রহণ, পাহাড়িদের জমি দখল করে সেখানে তাদের বসতি স্থাপন প্রভৃতি ঘটনা পাহাড়িদের মধ্যে ঘৃণাবোধের জন্ম দেয়। এর ফলে সেটেলারদের প্রতি তাঁদের এক ধরণের বিদ্বেষভাবের সৃষ্টি হয়। আবার, এখানে লক্ষ্যণীয় যে, স্থায়ী বা আদিবাসী বাঙালিদের প্রতি পাহাড়িদের রয়েছে পারস্পারিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহমর্মিতা। দেশের প্রতিটি বিপর্যয়ে পাহাড়িরাও দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বাঙালিদের মতোই বিষাদে মুষড়ে পড়ে। ফলে আমরা এখানে দেখতে পাই, জাতিগতভাবে পাহাড়িরা ভিন্ন সত্ত্বার হলেও অন্তরে বাংলাদেশি জাতিয়তাবাদ ধারণ করে এর ফলে তারা বাঙালি জাতিয়তাবাদের প্রতি কোনরূপ বিরূপভাব পোষণ করেছে বলে আমি মনে করি না। কিন্তু যখনই নিজেদের জাতিসত্ত্বার উপর আক্রমণ হয়েছে তারা প্রতিহত করেছে। কারণ, এই চাপানো জাতিয়তাবাদ তারা মেনে নিতে চায়নি। ফলে এখানেও জোর করে চাপিয়ে দেয়া সেটেলারদের পাহাড়িরা গ্রহণ করতে পারেনি। ভূমি দখলকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে বিরোধ বাড়তে থাকে এবং আর্মি-বিজিবি-পুলিশ সেটেলারদের সহায়তা করায় পাহাড়িরা বাঙালিদের প্রতি এক ধরণের তীব্র বিরূপ মনোভাব পোষণ করে যার ফলশ্রুতিতে আমরা আজকে তা চিহ্নিত করছি জাতিগত সমস্যা হিসেবে। সিএইচটি কমিশন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংস্থারা এখন তাই বলছেন জাতিগত সমস্যা। যেহেতু তারা বলছেন তাই আমাদের প্রতিটি মগজে আজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এ সমস্যার কথা। ফলে ভূমি সমস্যাটি একটু আড়ালে পড়ে যাচ্ছে।

ফলে সেটেলাররাও আজ প্রচার করছে জাতিগত সমস্যাটি মুখ্য। এ কথা বলার মাধ্যমে তারা পুরো দেশের বাঙালি সত্ত্বার সাথে নিজেদের মিলিয়ে রেখে পাহাড়িদের এর বিপরীতে দাঁড় করিয়ে দেয়। সেনাবাহিনীর বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থা এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করছে। সেজন্য পাহাড়ে তারা নিজেদের অভিহিত করে বাঙালি বলে, যদিও পাহাড়িদের বিরুদ্ধে এ্যাকশনের স্লোগান দেয়া হয় "নারায়ে তকবির, আল্লাহু আকবর"। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয় এখানে কিছু ধর্মান্ধতার ছাপ রয়েছে। এ ধর্মান্ধতা মৌলবাদী সংগঠন শিবিরের ক্ষেত্রেই বেশি প্রযোজ্য এবং যেহেতু বাঙালি ছাত্র পরিষদ সংগঠনের মধ্যে শিবিরপন্থী ও ননশিবিরপন্থী দুইটি অংশ রয়েছে এবং কোন অংশ এ্যাকশনে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে সেটা একজন বুঝদার মানুষ সহজেই বুঝতে পারবেন।

মিডিয়া থেকে শুরু করে প্রতিটি সাইটেই এর ছাপ পাওয়া যায়। "রাঙ্গামাটিতে পাহাড়ি-বাঙালি সংঘর্ষ" এই খবরের মাধ্যমে পাহাড়ের জাতিগত সমস্যাকেই মূলত প্রাধান্য করা হয়। কিন্তু সমস্যার মূলে যে ভূমি দখল বা ভূমির রক্ষার লড়াই তা আড়াল করে দেয়া হয়। আবার যে বাঙালিরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে তারা সেটেলার নাকি স্থায়ী আদিবাসী বাঙালি সে প্রসঙ্গেও কোন বক্তব্য প্রদান করা হয় না।

তাই আমি মনে করি, পাহাড়ের ভূমি সমস্যাই প্রধান। এ সমস্যা নিরসনে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৩নং আইন) পাশ করা হয় এবং কমিশনের কার্যালয় খাগড়াছড়ি সদরে স্থাপন করা হয়। পাঠক, আপনারা যদি খাগড়াছড়ি উন্নয়নের বোর্ডের রাস্তার দিয়ে হেঁটে যান তবে রাস্তার পূর্বপাশে এ কমিশনের দেখা মিলবে। কাগজে-কলমে এ কমিশনটি সক্রিয় থাকার কথা থাকলেও তা কতটুকু সচল রয়েছে তা কমিশনের কার্যালয়ের পাশ দিয়ে হাঁটলেই বুঝা যাবে। কার্যালয়টি সর্বদা বন্ধ অবস্থায় পড়ে থাকে এবং কার্যালয়ের প্রাঙ্গন এখন বড় বড় ঘাসের দখলে। ফলে, এ কার্যালয়ে কতটুকু কমিশনের সদস্যদের যাতায়াত ঘটে তা সহজেই অনুমেয়।

তাছাড়া, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের কাজ থমকে পড়ে আছে কারণ ভূমি সমস্যাকে আড়াল করে বর্তমানে সামনে হাইলাইট করা হচ্ছে জাতিগত সমস্যাকে। এ সমস্যার সমাধান না হলে যে ভূমি সমস্যার নিষ্পত্তি ঘটানো যাচ্ছে না!

এক নজরে চোখ বুলিয়ে আসি বিভিন্ন সরকারি আইন এবং পাহাড়ের ভূমি সংক্রান্ত আইনের উপর এক নজরে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সরকারি আইন

প্রথমেই জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে ক্রমান্বয়ে সরকারি আইনগুলো দেখে আসা যাক। বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডে আদিতম লিপিবদ্ধ আইন হলো ১৮২৪ সালের ১নং বঙ্গীয় প্রবিধান। ব্রিটিশদের লবণ বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষায় এই আইনটি প্রণয়ন করা হয়। ১৮৫০ সালের ১নং আইন এই আইনের স্থলবর্তী হয় এবং এ আইনের বদৌলতে জনপূর্ত কার্যক্রমের জন্য আরো জমি অধিগ্রহণের বিধান করা হয়। পরবর্তীতে ১৮৫৭ সালে জমি হুকুম দখল সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন একত্রিত ও সংহত করে ৬ নং আইন পাশ করা হয় এবং গোটা ব্রিটিশ ভারতে প্রয়োগযোগ্য করা হয়। সেচ, নৌপরিবহন, ডক ও পোতাশ্রয় উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গর্ভণর জেনারেল-ইন-কাউন্সিলকে অত্যাধিক ক্ষমতা প্রদানের জন্য ১৮৬৩ সালের ২২ নং আইন শিরোনামে নতুন এক আইন পাশ করা হয়। কিন্তু এই আইনে অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য নির্ধারণে কালেক্টর ও জমির মালিকদের মধ্যে ঐক্যমতে না পৌঁছলে তা সালিশদারদের এখতিয়ারে চলে যাওয়ার বিধান ছিল। সালিশদাররা অধিকাংশই দুর্নীতিবাজ এবং এতে সরকারি অর্থের প্রচুর ক্ষতিসাধন হওয়ার কারণে ১৮৭০ সালে ১০ নং আইন পাশ হয়। এর পরবর্তীতে ১৮৯৪ সালে ১ নং প্রবিধান পাশ করা হয়।

এর আগে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক প্রবর্তিত সূর্যাস্ত আইনে সকল জমি বন্দোবস্তী বা দলিলে লিপিবদ্ধ করা হয়। ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ত্ব আইন প্রবর্তন করা হয়। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ত্বের আইনের ফলে জমির উপর মালিকানা স্বত্ত্ব বা প্রচলিত অর্থে খতিয়ানের ব্যবস্থা করা হয়। খতিয়ান বলতে আমরা বুঝি ব্রিটিশ শাসনামল থেকে শুরু হওয়া ভূমি জরিপ, ক্যাডেস্ট্রাল সার্ভে (সি এস) যা ১৮৮৮ সালে শুরু হয়ে সংশোধনীসহ ১৯৪০ সালে সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে ১৯৫০ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ত্ব আইনটি নতুন করে

প্রণয়ন করা হয় এবং জমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ২৭-৩১ ধারা অনুযায়ী ১৯৫৬-৬০ সাল প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে এতে অনেক ভুল রেকর্ড থাকার কারণে পুনরায় ১৯৬৫ সালে কাজ শুরু হয় এবং স্বাধীন বাংলাদেশ আমলে রিভিশনাল সার্ভে (আরএস) সম্পন্ন হয়। ১৯৯৮-৯৯ সালে ভূমি জরিপ হালনাগাদের জন্য আবার কাজ শুরু হয়।

পার্বত্য অঞ্চলে ভূমি আইন

তিনটি পার্বত্য জেলা (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান) প্রথম থেকেই বিশেষ মর্যাদা ভোগ করে আসছে। বিশেষ অঞ্চল হিসেবে বিভিন্ন বিধি ও প্রজ্ঞাপন যেমন : ১৮৬০ সালের ২২নং আইন, ১৮৬৩ সালের ৪নং আইন, ১৮৭৩ সালের ৩নং বিধি এবং ১৮৮১ সালের ৩নং বিধি এই আইন দ্বারা পার্বত্য অঞ্চল পরিচালিত হয়ে আসছিল। পরবর্তীতে ১৯০০ সালের ১নং প্রবিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে মে, ১৯০০ সাল থেকে এ আইনটি প্রয়োগ করা হয়। এ আইন মোতাবেক পার্বত্য অঞ্চলের সকল জমির মালিক সরকার এবং এই অঞ্চল সংরক্ষিত বনভূমি বা অশ্রেণীকৃত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চল হিসেবে বিদ্যমান। ১নং প্রবিধানের আওতায় ডেপুটি কমিশনার আগে বসতি স্থাপিত হয়ে থাকলেও সেসব জমি দখলে ক্ষমতাবান। অনুরূপ ক্ষেত্রে জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা প্রবিধানে রাখা হয়েছে। এই আইন অনুসারে জেলা প্রশাসক পাহাড়ি কোন পরিবারকে ৫ একর ভূমি প্রদান করতে পারবেন। পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম (ভূমি অধিগ্রহণ) প্রবিধান, ১৯৫৮ সাল (১৯৫৮ সালের ১নং প্রবিধান) পাশ করা হয়। এ আইনের ৩ নং ধারার ১নং উপধারায় বলা হয়েছে "বৈধ স্বত্ত্বাধিকার বিশিষ্ট কোন ভূমি যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রবিধান, ১৯০০ বা এর অধীন প্রণীত অন্য কোন আইন দ্বারা পুনঃগ্রহণ করা সম্ভব হয় না, কিন্তু জনস্বার্থে উক্ত ভূমি আবশ্যক হয় তখন জেলা প্রশাসক লিখিত আদেশের মাধ্যমে অনুরূপ ভূমি অধিগ্রহণ করিতে পারিবেন।" এর আগে ১৯৩৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাজার ফান্ড বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়।

এরপর খাগড়াছড়ি জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ সালের ১৯নং, ২০নং এবং ২১নং আইনানুসারে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তির আলোকে ১৯৯৮ সালে ১০নং আইন দ্বারা তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আইন সংশোধন করা হয়। পার্বত্য জেলাসমূহ (আইন রহিত ও প্রয়োগ এবং বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ১৬নং আইন) এবং ২০০৩ সালের ৩৮নং আইন প্রণয়ন করা হয় কিন্তু সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা তারিখ নির্ধারণ করা হয়নি, সে কারণে আইন দুটি এখনো অকার্যকর হয়ে পড়ে আছে।

পাহাড়ের ভূমি সংক্রান্ত আইনের বিভিন্ন গলদসমূহ

১৯৮৯ সালের ১৬নং আইনের ৩নং ধারায় ১৯০০ সালের ১নং প্রবিধানটি রহিত করার

কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু আইনটি অকার্যকর অবস্থায় থাকার কারণে বাস্তবিক অর্থে পার্বত্য অঞ্চলে এখনো প্রবিধানটি বহাল রয়েছে। অপরদিকে, পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ সাল (চুক্তি-পরবর্তী সংশোধিত) এর ৬৪ নং ধারার ১নং উপধারায় বলা হয়েছে, আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন- (খ) জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সহিত আলোচনা ও উহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না। এখানে স্পষ্টতই দুইটি আইন পরস্পরবিরোধী। ১৯৫৮ সালের ১নং প্রবিধান আইনে জেলা প্রশাসককে জমি অধিগ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা বাংলা, বিহার ও কাশীরাজ্যে চালু হয় কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে এ আইনটি কার্যকর ছিল না। এ কারণে পাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে অবহিত না করার কারণে এ অঞ্চলে ভূমি বন্দোবস্ত বা দলিলপ্রথার প্রচলন হয়নি।

১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ত্ব আইন প্রণয়ন করা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে এ আইনটি কার্যকর করা হয়নি। পরবর্তীতে সংশোধিত আইনেও আদিবাসীদের ভূমি অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে কোন ধারা প্রণয়ন করা হয়নি।

ক্যাডেস্ট্রাল সার্ভে এবং রিভিশনাল সার্ভে, ভূমি জরিপ হালনাগাদের কাজ বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলে করা হলেও পার্বত্য অঞ্চলটিকে বাদ দেয়া হয়েছে।

এ সমস্ত কারণে পার্বত্য অঞ্চলে বন্দোবস্ত বা দলিলকৃত জমির পরিমাণ কম বিধায় পরবর্তীতে দেশের সামরিক সরকারগুলো খুব সহজেই পাহাড়িদের ভূমি উচ্ছেদসহ দখল করার সুযোগ পেয়েছে।

আরো একটি নতুন অধ্যায় : সংরক্ষিত বনাঞ্চল (Reserved Forest & Protected Forest)

ভারতের বনভূমিসমূহ সংরক্ষণার্থে ব্রিটিশ সরকার প্রণয়ন করে বন আইন ১৯২৭ সাল এ্যাক্ট। এই আইনানুসারে পার্বত্য অঞ্চলের এক-চতুর্থাংশ এলাকা সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরবর্তীতে এই আইন সংশোধন ও সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে এক-তৃতীয়াংশকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল করার পরিকল্পনা করা হয়। ১৯৯০-৯৮ সালের মধ্যে প্রায় ২,১৭,৭৯০ একর এলাকা সংরক্ষণের আওতায় পড়ে যায়। এর মধ্যে ১,৪০,৩৪১ একর ইতিমধ্যে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তিনটি পার্বত্য জেলায় এই বনাঞ্চল তৈরি করা হয়। খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা সদর, দিঘীনালা, আলুটিলা এলাকা; রাঙ্গামাটির রাজস্থলী, লংগদু, বরকল, নানিয়াচর সহ প্রায় ৮৩টি মৌজায় এই বনাঞ্চল গড়ে ওঠে।

২০০০ সালে বন আইন, ১৯২৭ এ্যাক্ট সংশোধন করার পর দেখা গেছে, সংরক্ষিত বনভূমির মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামগুলোও এর আওতায় পড়ে গিয়েছে।

রাজস্থলীর আড়াছড়ি গ্রামের কথা বলা যাক, গ্রামটি 'খিয়াং' জাতি অধ্যুষিত। এই গ্রামটির অধিকাংশ পরিবার বর্তমানে উচ্ছেদের সম্মুখীন। এসব পরিবারগুলোর একমাত্র অবলম্বন জুমচাষ। সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কবলে পড়ে তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন আজ ধ্বংসের পথে। ১৯৭৬ সাল থেকে তারা জুমচাষ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। বনাঞ্চলের ক্ষতি হয় এমন কোন কার্যকলাপ আইনের আওতায় আনা হয়েছে অত্যন্ত কঠোরভাবে। ফলে পার্বত্য অঞ্চলের খেটে খাওয়া মানুষরা নতুন সংকটের সম্মুখীন হচ্ছেন। এছাড়া, Protected Forest এর মেয়াদ নির্ধারিত ছিল ৩০ বছর, পরবর্তীতে একে বাড়িয়ে আজীবন করা হয়। ফলে, এই বনভূমির পাশ্ববর্তী গ্রামের পাহাড়িরা জীবন ধারণে দারুণ সংকটে নিমজ্জিত হয়েছেন।

১৯০০ সালের রেগুলেশন এ্যাক্ট অনুসারে, জেলা প্রশাসক প্রতিটি পাহাড়ি পরিবারকে ৫ একর বাড়ির পাশ্ববর্তী বনভূমি প্রদান করার এখতিয়ার রাখেন কারণ পাহাড়ি পরিবারটি যেন তার নিত্য জিনিসপত্র যেমন কাঠ-বনের ফলমূল-বাঁশ প্রভৃতি সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু এই আইনের বদৌলতে কঠোরভাবে বনভূমি রক্ষার নামে চলমান প্রক্রিয়া পাহাড়িদের জীবনের উপর হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে পাহাড়িরা একদিকে অনেক আগে থেকেই চাষ করে আসা বনভূমিকে হারাচ্ছেন আবার অন্যদিকে নিজেদের জীবনযাত্রার উপরও আঘাত আসছে।

সংরক্ষণ যদি সংরক্ষণই হয়ে থাকে তবে সেনাবাহিনীকে প্রদান কেন?

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, সংরক্ষিত বনভূমির প্রায় ১,৭৮৮.৯৮ একর এলাকা সেনাবাহিনীকে প্রদান করা হয়েছে সেনানিবাস স্থাপনের জন্য। কক্সবাজারের রামু উপজেলায় এই এলাকা দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও, বান্দরবানের রুমায় ৯৭৭ একর জমি প্রদান করা হবে আরেকটি সেনানিবাসের জন্য। দুইটি সেনানিবাস করতে প্রয়োজন হবে মোট প্রায় ৪৮ হাজার একর জমি। যেখানে অনেক আগে থেকেই সংরক্ষিত বনভূমি হিসেবে এই এলাকাগুলোকে ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর দুইটি সেনানিবাসের স্থাপনের জন্য এই বিশাল এলাকা ছাড় দেয়া হচ্ছে। আর সমস্ত প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হচ্ছে বন আইন ১৯২৭ এর সংশোধিত ২০০০-এর ২৭ ধারার ক্ষমতাবলে।

পার্বত্য অঞ্চলের বনাঞ্চল যদি সংরক্ষণ করতেই হয় তবে তা দেশের কল্যাণের জন্য তা করা উচিত। কিন্তু সাধারণ পাহাড়িদের উচ্ছেদ করার পর সে এলাকা সেনাবাহিনীর জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করে প্রদান করা কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে একতরফাভাবে সামরিক বাহিনীগুলোকে ক্রমাগত মদদ দেয়ার মাধ্যমে সরকার পার্বত্য অঞ্চলে কি বার্তা দিতে চায়?

একটু পিছনে ফিরে যাওয়া এবং পর্যালোচনা

ক্যাপ্টেন লিউইন ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের কমিশনার। তিনি তার সুপারিশনামায় লিখেছিলেন "এই পাহাড়-পর্বতগুলিকে আমরা যেন কেবল আমাদের নিজ স্বার্থেই শাসন

না করি, আমরা যেন কেবল এই পাহাড় অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বার্থেই, তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের নিমিত্তেই তাহাদের শাসনকার্য পরিচালনা করি। সভ্যতাই সভ্যতা সৃষ্টি করে-সভ্যতা সভ্যতারই ফসল, ইহার কারণ নহে। শাসন-কার্যে যোগ্যতাসম্পন্ন কোন কর্মচারীকে এই পাহাড় অঞ্চলের মানুষগুলির শাসনকার্য পরিচালনার জন্য নিয়োগ করিতে হইবে। এই সকল অঞ্চলে এরূপ শাসক চাই যিনি সরকারী শাসনচক্রের একটি অংশমাত্র হইবেন না, সমশ্রেণীভুক্ত এই জীবদের (অর্থাৎ পার্বত্য-অধিবাসীদের) ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে তাহাকে যথেষ্ট সহনশীল হইতে হইবে; যে সহানুভূতির স্পর্শে বিশ্বের সকল মানুষকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করা সম্ভব, তাঁহাকে সেই সহানুভূতি অনায়াসে ও দ্রুততার সহিত তাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে হইবে। সেই শাসককে নুতন নুতন চিন্তাধারার উদ্ভাবন এবং সেই চিন্তাধারার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিতে ও তাহা সফলভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু তাহাদের জাতীয় ঐহিত্য ও সংস্কারে যাহাতে আঘাত না লাগে, তাহার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। এই প্রকার কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় থাকিলে তাহারা নিজেরাই নিজেদের সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবে। শিক্ষার উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা পাইলে তাহাদের নিজস্ব সামাজিক রীতিনীতি দ্বারা চালিত হইয়া কালক্রমে তাহারা ইংরেজ জাতি অপেক্ষা কোন অংশে হীন ও নিম্নস্তরের মানুষ হইবে না, তাহারা গড়িয়া উঠিবে ভগবানের সৃষ্ট জীবকুলে একটি মহৎ আদর্শরূপে।"

ক্যাপ্টেন লিউইন স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন পাহাড়িদের জীবন-জীবিকার চরিত্র রক্ষার্থে কি ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। পরবর্তীতে ১৯০০ সালের রেগুলেশন এ্যাক্টও এই সুপারিশ অনুযায়ী করা হয়। পাহাড়িরা সত্যিকারের পাহাড়ে সন্তান এবং এই পাহাড়-বনভূমি-প্রকৃতি রক্ষা করবে এই সন্তানরাই। কিন্তু আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, একদিকে ভূমি দখল অন্যদিকে সংরক্ষণের নামে ব্যবহৃত বনাঞ্চল কেড়ে নেয়া হচ্ছে পাহাড়িদের কাছ থেকে। যে পাহাড়িদের কাছে এই পাহাড়-বনভূমি এতকাল ধরে সংরক্ষিত ছিল।

এইসকল আইনের বদৌলতে পার্বত্য অঞ্চলে সেনাবাহিনী ও তার সহযোগী সংস্থা বাঙালি ছাত্র পরিষদ, সমঅধিকার আন্দোলনসহ ৮টি সংগঠন বর্তমানে পাহাড়ের এই সকল অব্যবস্থাপনার সুযোগে পাহাড়িদের নিজ ভিটেমাটি হারা করছে। যেহেতু বিজিবি ক্যাম্পগুলো পার্বত্য চুক্তির আওতার বাইরে তাই এখন তারা বিজিবি'র মাধ্যমে জমি দখল করছে। একসময় তারা সরাসরি আঘাতের মাধ্যমে পাহাড়িদের তাড়িয়ে জমি দখল করত, এখন আইনের সহায়তায় এবং বিভিন্ন সদ্যপ্রসূত আইনের বদৌলতে পাহাড়িদের জমি ও দখলিকৃত বনাঞ্চল হাতিয়ে নিচ্ছে। পার্বত্য চুক্তির প্রায় ৬০% বাস্তবায়ন করা হয়েছে এই দাবি করা হলেও বাস্তবে তার কোনটাই দেখা মেলেনি। পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যাগুলো যথাযথ সমাধান না করে বরং সরকার তার স্টীম রোলার অব্যাহত রেখেছে পাহাড়িদের প্রতি।

শেষ কথা

পাহাড়ের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ পার্বত্য অঞ্চলের অস্থিতিশীল পরিবেশের ধারবাহিকতারই একটি অংশ। প্রতিটি ঘটনাকে নতুন রূপ দেয়া হয় পরিস্থিতিকে অশান্ত করার লক্ষ্যে আবার পাহাড়ের প্রধান সমস্যাগুলোকে আড়ালে ঠেলে দেয়ার এক প্রক্রিয়া হিসেবে এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু আমাদের চোখ রাখতে হবে মূল সমস্যাকে কেন্দ্র করে। নইলে পাহাড়ের এই ঘটনাপ্রবাহকে কোনখাতে প্রবাহিত করার প্রচেষ্টা চলছে তা বোঝার উপায় আর আমাদের জানা থাকবে না।

তথ্যসূত্র

১. বাংলাদেশের উপনিবেশ, রওনক জাহান সম্প্রীতি, সাতকাহন http://satkahan.com/2013-12-11-22-26-16/2024-2014-06-21-09-21-02

২. ব্লগ পোস্টঃ দিঘীনালার বাবুছড়ায় যা ঘটছে, বিজিবি ক্যাম্প স্থাপন ও পাহাড়িদের জমি বেদখল http://chtbd.org/archives/2779#.U73C9UB5E_4

৩. পার্বত্য জেলা বিষয়ক আইনঃ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত

৪. পৃষ্ঠা নং ১৭, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, [Capt. Lewin: Hill Tracts of Chittagong, P. 118]

5. Life and Nature at Risk, Philip Gain. Published by The Society for Environment & Human Development, July 2000.

৬. বিভিন্ন নিউজ পোর্টাল থেকে সংগ্রিহীত খবর।

চাকমা কিংবদন্তী

কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা

এক বুড়ো-বুড়ীর কেবল দুই ছেলে। একজন মেয়ের জন্য বুড়ো-বুড়ীর প্রবল আকাঙ্ক্ষা কিন্তু বিধিবাম, বুড়োবুড়ীর ইচ্ছে পূরণ হল না। তাই তারা খুব আদরের সাথে, ছোট ছেলেকে 'মা' বলে ডাকত। তাই বলে বড় ছেলেকে আদর করত না তা নয়। মা-বাপের অগাধ স্নেহে দুই ভাই বেড়ে উঠতে লাগল। বুড়ো-বুড়ীও ছেলে দুটিকে নিয়ে মনের সুখে দিনাতিপাত করতে লাগল।

সময়ের সাথে বুড়ো-বুড়ী ক্রমে বুড়িয়ে যেতে লাগল। ওদিকে বড় ছেলে কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পদার্পণ করলে বুড়ো-বুড়ী ছেলের জন্য মনে মনে পাত্রী খুঁজতে লাগল। কিন্তু তাদের পছন্দ মত পাচ্ছিল না যদিও তাদের পাত্রী সন্ধানে বিরাম ছিল না। বুড়ো-বুড়ী ভাবে বড় ছেলের জন্য বউ আনতে পারলে সংসারের ঝামেলা হতে তারা উভয়ে যেমন মুক্তি পাবে অন্যদিকে সুদূরে অবস্থানরত আত্মীয় স্বজনদের কাছে বেড়াতেও অসুবিধা হবে না। বুড়ো-বুড়ী হয়তো এমন এক মেয়ের সন্ধান পেল যে মেয়েটির চেহারা সুন্দর কিন্তু সাংসারিক কাজকর্মে বিশেষ করে বুনন কাজে অপটু হওয়ায় তারা সে মেয়েকে পছন্দ করতে পারল না। আবার হয়তো সাংসারিক কাজকর্মে পারদর্শী এমন এক মেয়ের সন্ধান পেল যার বাহ্যিক চেহারা একেবারে অপছন্দনীয় এবং মাথার চুল পাতলা হওয়ায় সে মেয়েকেও তারা পুত্রবধু হিসেবে ঘরে আনার সম্মতি দিতে পারল না। বুড়ো-বুড়ীর মতে তাদের বড় ছেলের জন্য এমন মেয়েকে বউ হিসেবে ঘরে আনবে যে মেয়ে চেহারায় গড়নে কথাবার্তায় সাংসারিক যাবতীয় কাজকর্মে হবে সুনিপুণা। বিশেষ করে 'বুনোকাদাত'(বুনন কাজে) তো পটু হতে হবেই। পুত্রের জন্য বউ দেখতে বুড়ো-বুড়ী এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে কাটাতে লাগল। স্বাভাবিকভাবে পরিবারের কাজ-কর্মাদি বড় ছেলের উপর এসে পড়ল।

একদিন বুড়ো-বুড়ীর ছেলেটি বাড়ী হতে বেশ দূরে জুমে কাজ করতে গেল। এদিকে ছোট ভাই মা-বাপের একান্ত আদরের বলে সাংসারিক কাজকর্মে ছিল সে একেবারে উদাসীন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, কাজ করার মত বয়স তখনও তার হয়নি। প্রায় সারাক্ষণই খেল-াধুলা নিয়ে মেতে থাকত। বড় ভাই খুব ভোরে কাজে যাওয়ার সময় সাথে ভাতের মযা (মোচা) নিয়ে গেল না। কারণ খুব প্রত্যুষে রান্না করা ভাত সাথে করে নিলে অপরাহ্নে খাওয়ার সময় বাসি ভাত খেতে হবে। যাওয়ার সময় তার মাকে বলে গেল- ছোট ভাইকে

দিয়ে যেন তাকে দুপুরের ভাত মযা(মোচা) পাঠিয়ে দেয়া হয়। তামাক সহ হুকা, একটি বেণা এবং একটা পান কুত্তি (পানির পাত্র) সাথে নিয়ে বড় ভাই জুমের মোনঘরে রেখে কাজ করতে লাগল নিরলসভাবে। প্রখর রৌদ্রে অতিরিক্ত ক্লান্তিবোধ করলে জুমের মোনঘরে এসে বিশ্রাম নিতো। আর বিশ্রামের মধ্যে হুকা সেজে তামাক খেতো, তৃষ্ণায় ছটফট করলেও পানি পান করত বিশ্রামের মধ্যে, বিশ্রাম শেষে আবার নেমে পড়ত কাজে। কাজে তার কোন ফাঁকি নেই। ভাবতো জুমের ফসল ভাল হলে লাভবান হবে তারা নিজেরাই। আর ভাল ফসল পেলে বউ ঘরে আসলে অভাবে থাকতে হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে কল্পনার জগতে পাড়ি জমাত।

কাজ করতে করতে সূর্য যখন পশ্চিম দিগন্তে হেলিয়ে পড়ল তখনো ছোট ভাই বড় ভাইয়ের জন্য খাবার নিয়ে এল না। এদিকে খিদের জ্বালায় বড় ভাই আর প্রখর রৌদ্রে কাজ করতে পারল না। মোনঘরে ফিরে এসে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহে বিশ্রাম নেওয়ার এক পর্যায়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তার কিছুক্ষণ পর ছোট ভাই তরকারিসহ ভাতের মযা (মোচা) নিয়ে এসে হাজির। তখন কিন্তু বড় ভাই ঘুমে বিভোর। ছোট ভাই বড় ভাইকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল। বলল, "দাদা, মা-ত' সমারে ম' ভাদও পাদে দ্যা। এক সমারে ভিলে খেদং (অর্থাৎ দাদা, মা, তোমার ভাতের সাথে আমার ভাতও পাঠিয়েছে-একসাথে নাকি খেতাম)। বড় ভাই ছোট ভাইয়ের নিয়ে আসা মযা (মোচা) দেখে মনে মনে ক্ষুণ্ন হল। কারণ ভাতের মযাটা (মোচাটা) ছিল অপেক্ষাকৃত দেখতে ছোট। মনে মনে ভাবল, প্রচন্ড খিদের মধ্যে আমার নিজেরই ভাত হবে না' আর নাকি দুই ভাইয়ের ভাত এতে। তবুও বড় ভাই ছোই ভাইকে তার রাগের কথা প্রকাশ করল না। ভালমন্দ কিছু না বলে সে তাড়াতাড়ি পাথরের উপরে তাগলটা (দা-টা) শান দিতে লাগল। বড় ভাই তাগলে শান দিচ্ছে তো দিচ্ছে। এক পর্যায়ে ছোট ভাই বড় ভাইকে লক্ষ করে বলল, দাদা, কই তত্তুন দ' ভিলে পেদ পুরের। ভাত-ন খেই তুই আ ক্যা তাগল ধারর? থিক আগে ভাত্তুন মনত ন' পল্ল্যে মুই ন' খেইম। অর্থাৎ দাদা, তোমার তো নাকি খিদে পেয়েছে অথচ তুমি ভাত না খেয়ে দা-তে শান দিচ্ছ। ঠিক আছে আমিও খাব না।

বড় ভাই ছোট ভাইয়ের কথায় কর্ণপাত করল না। ইচ্ছেমত তাগলে শান দিয়ে সে ছোট ভাইয়ের কাছে এসে চুলে জড়িয়ে ধরল। তাগলের এক কোপে ছোট ভাইয়ের মস্তক ছিন্ন করল। মৃত্যুর আগে ছোট ভাই বড় ভাইকে শুধু এটুকু বলতে পেরেছিল যে, 'দাদা, তরে ভাত বারেদ্যা এনেই মত্তুন মরা পরের। ইয়ানত্যায় তুইয়ো পোত্তেবে। "অর্থাৎ- দাদা, তোমাকে ভাত দিতে এসে আমাকে মরতে হচ্ছে, দেখবে এজন্য তোমাকেও অনুতাপ করতে হবে। "

ছোট ভাইকে হত্যার পর বড় ভাই- ভাতের মযা (মোচা) খুলে ভাত খেতে গেল। ভাতের মযা (মোচা) খুলে দেখে ভাতগুলো তখনো গরম। তার মা ভাতগুলো যাতে ঠাণ্ডা হয়ে না

যায় সেজন্যে খুব করে চেপে চেপে মযা (মোচা) করে দিয়েছিল। বড় ভাই ভাত মযার (মোচার) এক তৃতীয়াংশ মাত্র ভাত খেতে পারল। বাদ বাকী পড়ে রইল দুই তৃতীয়াংশ। ততক্ষণে বড় ভাইয়ের (পাষণ্ড) হৃদয়ে করুণার ভাব উদয় হল। যে ভাতের মযাটা ছোট দেখে দুই ভাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ভাত হবে না ভেবে উন্মুক্ত হয়ে ছোট ভাইকে হত্যা করল অথচ সে ভাতের দুই তৃতীয়াংশ এখন উচ্ছিষ্ট রয়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে তার ছোট ভাইয়ের দেহ নিথর-নিষ্প্রাণ। তড়িঘড়ি সে ছোট ভাইয়ের ছিন্ন মস্তক দেহের সাথে জড়িয়ে কোলে নিয়ে ক্রন্দন করতে লাগল- উচ্চস্বরে।

বড় ভাইয়ের ক্রন্দনের কোন বিরাম নেই। ক্রমে রাত ঘনিয়ে এল। দিন এল আবার রাত, ক্রন্দন করতে করতে তারই চোখের জলে ডুবে মরে গেল বড় ভাই। মৃত্যুর পরেও সে ভ্রাতৃঘাতী বড় ভাই মুক্ত হল না। তাকে মানব জীবন ছেড়ে ইতরপ্রাণী পক্ষী হিসেবে জন্মগ্রহণ করতে হল। সে পাখিটি নাকি এখনো পর্যন্ত পাহাড়ে অরণ্যে ঝোপে ঝাড়ে তার ছোট ভাইকে খুঁজে খুঁজে বেড়ায় স্থান হতে স্থানান্তরে। করুণ সুরে ডাকে ও 'ভেইধন চিক' অর্থাৎ 'ওহে ভাইধন', সোনাটি।

লেখক : কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা
সংগৃহীত

বি:দ্র: এই গল্পটি পড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের চলমান ভ্রাতৃহত্যার মর্মপীড়া উপলব্ধি করুন।

ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত ও বৃহৎ নৃ-গোষ্ঠীর আগ্রাসন

সম্প্রীতি চাকমা

'এই মন্দ দুনিয়ায় কিছুই স্থায়ী নয়, এমনকি আমাদের সমস্যাগুলোও নয়।'
- চার্লি চ্যাপলিন, ব্রিটিশ অভিনেতা ও চলচ্চিত্রকার

প্রাক-বয়ান

বর্তমানে জুম্ম আদিবাসী সমাজে চলমান ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত, কুটিল রাজনীতি ও সর্বগ্রাসী নৈতিক অবক্ষয় আমাদের জীবন ও মনোজগৎকে প্রতিনিয়ত দুঃস্বপ্ন তাড়িত করছে বললে নিশ্চয় অত্যুক্তি হবে না। সেই সাথে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ নানান্ চাপ ও আগ্রাসনে পাহাড়ের মানুষের বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতা আজ সত্যি বিপন্ন, অবরুদ্ধ। আদিবাসী, উপজাতি, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী, বৃহৎ নৃ-গোষ্ঠী, বাঙালি, বাংলাদেশি প্রভৃতি শব্দ নিয়ে অনাবশ্যক কুটতর্ক আর রাজনীতিও যেন শেষ হবার নয়। জাতিগত আগ্রাসনের মূল সমস্যা থেকে জনগণের দৃষ্টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করাই এর আসল উদ্দেশ্য, যা রাষ্ট্রশক্তি সুকৌশলে এযাবৎ করে আসছে। দেশের বৃহৎ নৃ-গোষ্ঠীর শঠতাপূর্ণ জাত্যাভিমানের চোরাবালিতে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো প্রভৃতি জাতির আত্মপরিচয় ও মর্যাদার ক্রমবিলুপ্তি দেখে দেখে আদিবাসী মানুষের মন আজ বড় ক্লান্ত, সংক্ষুব্ধ। মানবিক মর্যাদাহীনতা ও বঞ্চনার বোধ তাদের হৃদয়-মনকে দিন দিন আচ্ছন্ন করে ফেলছে। সারা পৃথিবীজুড়ে আত্মসচেতন ও আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন যে কোন আদিবাসী, প্রান্তিক মানুষই আজ অনুরূপ বেদনায় ভারাক্রান্ত।

জুম্ম সমাজের আত্মঘাতী মরণযাত্রা, শাসকগোষ্ঠীর আনন্দিত উসকানি আর সাধারণ মানুষের বিপন্নতা যে কোন সংবেদনশীল মানুষকে ব্যথিত উদ্বিগ্ন করছে বলে আমার বিশ্বাস। দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির নামে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের সহায়তায় শাসকগোষ্ঠীর নানা রূপকল্প/স্বপ্নকল্প বাস্তবায়নের কাজও যথারীতি চলছে। সেখানে নিশ্চয়ই আদিবাসীদের বর্তমান দুরবস্থার বিষয়টি আগে থেকে নির্ধারিত আছে। না হলে পাহাড়ে সমতলে যে কোন অজুহাতে সাম্প্রদায়িক হামলা, ভূমি জবরদখল এবং আদিবাসী নারীর উপর সহিংসতার ঘটনা এত দ্রুত বাড়ছে কী করে? আর আমাদের সমাজে অপরিণামদর্শী ও কলহপ্রবণ মানুষের সংখ্যাও কি দিন দিন বেড়ে চলেছে? না হলে সবখানে কেন আজ এত ভাঙনের সুর? রাজনীতি, ধর্ম, শিক্ষা, বাণিজ্য, উন্নয়ন এমন কোন সেক্টর কি আছে যেখানে আমরা ঐক্য, সংহতি ধরে রাখতে

পেরেছি? সামাজিক সংহতি, শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সামষ্টিক উন্নয়নের বিষয়গুলোকে এখন ঠিক করতে না পারলে কেমন হবে আমাদের আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যত? শাসকগোষ্ঠীর বহুমুখী আগ্রাসন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আমরা যেভাবে নানা কণ্ঠে সোচ্চার হই তার চেয়ে জুম্ম জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার কাজটি কি কম গুরুত্বপূর্ণ? আসলে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারলে পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন হোক কিংবা পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনই হোক, কোনটিই তো কখনও অর্জিত হবে না। ঐক্য প্রসঙ্গে মিয়ানমারের গণতন্ত্রপন্থী নেত্রী অং সান সু চি'র একটি বক্তব্য এখানে স্মরণ করছি। নিজেদের অনৈক্য সম্পর্কে অনুসারীদের সতর্ক করে দিয়ে তিনি একবার বলেছিলেন, 'গণতন্ত্র (এখানে পড়ুন জুম্মদের স্বাধিকার) প্রতিষ্ঠায় জনগণকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এটি অত্যন্ত পরিষ্কার ও খোলাখুলি ব্যাপার। আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে ব্যর্থ হলে কিছুই অর্জন করতে পারবো না।' দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যাণ্ডেলাও তার দেশের শতধাবিভক্ত রাজনীতিকে ঐক্যবদ্ধ করে জনগণের প্রকৃত মুক্তি ছিনিয়ে এনেছিলেন। জুম্ম জাতীয় মুক্তির প্রতীক প্রয়াত শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাও নিজের জীবনের বিনিময়ে রাজ-নীতিতে ঐক্যের অপরিহার্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তাহলে সেই ঐক্য কার বা কাদের প্ররোচনায় যুগ যুগ ধরে আমাদের কাছে সোনার হরিণ হয়ে থাকবে?

রাষ্ট্রের আদিবাসী নির্মূলীকরণ নীতি সম্পর্কে আমরা কতটুকু সচেতন?

বিশ্বের দেশে দেশে শোভিনিস্ট জাতিরাষ্ট্রগুলো 'এথনিক ক্লিনজিং' এর মাধ্যমে দেশের অপরাপর ভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির মানুষকে হয় পুরোপুরি ধ্বংস বা আত্মীকৃত করেছে নয়তো দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করে ধুঁকে ধুঁকে মারছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। যুগ যুগ ধরে এদেশে আদিবাসীদের উপর দমন-পীড়ন চলছে। তবুও রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারণী মহল থেকে শুরু করে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ বাঙালি সমাজ মনে করে, আমরা তথাকথিত উপজাতিরা, বিশেষভাবে চাকমারা নাকি বেশ ভালো আছি। চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ রাষ্ট্র প্রদত্ত সকল সুযোগ সুবিধা হাতিয়ে নিয়ে আমরা নাকি এখন অনেক উন্নত। অথচ (বাঙাল-বিবেচনায়) এত উন্নতির পরও আনুমানিক পাঁচ লক্ষাধিক জনসংখ্যার চাকমাদের সম্মিলিত আর্থিক সম্পদ ঢাকার কারওয়ান বাজারের আড়তদারদের মোট পুঁজির সমপরিমাণ হবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বসুন্ধরা, ট্রান্সকম, স্কয়ারের মতো শিল্পগোষ্ঠী কিংবা সারা দেশে রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী-আমলাদের যেসব ব্যাংক এবং অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেগুলোর সাথে তুলনা নাইবা করলাম। সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটির মালিকানা হাতে পেলেও পুরো চাকমা জাতি বর্তে যেতো বলে আশা করি। চাকমাদের আরেকটি বড় অপরাধ হলো, দেশের অন্যান্য সকল জনগোষ্ঠীর তুলনায় তাদের শিক্ষার হার নাকি সর্বোচ্চ। রাজনীতি সচেতন হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে কোন অধিকার আন্দোলনের মূল হোতা বা ষড়যন্ত্রকারী নাকি চাকমারাই। অন্যসব জাতিকেও তারা যুগপৎ সুবিধাবঞ্চিত ও বিপথে পরিচালিত করছে, এমন অভিযোগ এনে একশ্রেণীর 'দেশপ্রেমিক' বাঙালি এখন চাকমা

জাতির উপর সর্বান্তকরণে খড়গহস্ত। শিক্ষায় মোটামুটি অগ্রসরতার কারণে চাকমা সমাজে একটি চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইতোমধ্যে গড়ে উঠেছে বটে। সেখানে কিছু ডাক্তার, ইঞ্জি-নয়ার, স্থপতি, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সামরিক-বেসামরিক আমলা, আইনজীবী, এনজিও কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, ব্যাংকার প্রভৃতি রয়েছেন। প্রশ্ন হলো, এই কয়েকজন কর্মকর্তাকে বিবেচনায় নিয়ে ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক একটি জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিমাপ করা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত, যেখানে তাদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষকে আজও দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করতে হয়? শহরাঞ্চলের কিছু মানুষকে দেখে সাধারণ বাঙালি মানস এবং তাদের 'দেবোনা' আক্রান্ত মন যদি সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, দেশের সকল চাকমা শিক্ষা-দীক্ষা-বিজ্ঞান-অর্থনীতিতে বাঙালিকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে এবং সেকারণে তাদের রাশ টেনে ধরতে হবে, তাহলে ধরে নিতে হবে মানবিক উদারতায় এবং তৃণমূলের সমাজ বাস্তবতার নির্মোহ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাঙালি এখনও অনেক পিছিয়ে আছে। তাছাড়া এখানে 'বাঙালিরা দিচ্ছে', 'আমরা দিচ্ছি' জাতীয় প্রশ্ন উঠবে কেন? দেওয়ার মালিক তো রাষ্ট্র।

রাষ্ট্র তার সব নাগরিকের জন্য মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করাসহ উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ ও সমসুযোগ সৃষ্টি করবে। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নাগরিকগণ নিজেদের শ্রম, অধ্যবসায় ও সৃষ্টিশীলতা দিয়ে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন। তাদের উন্নতির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রও উন্নত, সমৃদ্ধ হবে। চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বাঙালি, গারো নির্বিশেষে এদেশের আপামর জনগণ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নাগরিক। দেশের সংবিধান অনুযায়ী তাদের সকলেরই অধিকার সমান। কারও কম বা কারও বেশি নয়। নিজ নিজ জাতিভুক্ত প্রত্যেক সাবালক আদমির এক একটি ভোটের মর্যাদাও সমানে সমান। শাসক নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ভোটারের ক্ষমতা ও ভূমিকা সমান গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং 'আমরা তোমাদের সবকিছু দিচ্ছি' জাতীয় অনুদার, আগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গি দেশের সংবিধান আর এ যুগের গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। মূল কথা হলো, এখানে কেউ কাউকে যেচে কিছুই দিচ্ছে না। সকলে নিজের চেষ্টায়, শ্রমে-ঘামে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। রাষ্ট্র কর্তৃক সমমর্যাদা ও সমসুযোগ নিশ্চিত করা হলে আদিবাসীরা আর্থ-সামাজিকভাবে সমৃদ্ধ এবং দেশমাতৃকার কল্যাণে আরও বেশি আত্মনিয়োগ করতে পারতো একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এই সমমর্যাদা ও সমসুযোগ সৃষ্টির দায়িত্ব দেশের বৃহৎ নৃ-গোষ্ঠীর উপরই বর্তায়। অথচ এর উল্টো কাণ্ডটিই এদেশে ঘটছে। তাই বৃহৎ নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ হলে মনেও বড় হবে- এমন উদার মতবাদ সম্ভবত বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য নয়।

ইদানীং দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ে আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সংহতির প্রতীক চাকমা রাজবংশকেও একশ্রেণীর বাঙালি বুদ্ধিজীবী এখন তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করছেন (বিস্তারিত জানতে দেখুন : সৈয়দ ইবনে রহমতের লেখা- 'চাকমা রাজ পরিবারের গোপন ইতিহাস', সূত্রঃ www.parbattanews.com)। আদিবাসী বিদ্বেষী প্রচারণার অংশ হিসেবে চাকমাদের মর্যাদার, অহংকারের সব বিষয়কে এখন টার্গেট করা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে অতি 'দেশপ্রেমিক' বাঙালদের বেশ কয়েকটি ওয়েবসাইট, ব্লগ এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যম রয়েছে। সেখানে বাঙালি জাতিকে 'আদিবাসী' হিসেবে প্রমাণের একটি মরিয়া, হাস্যকর

প্রচেষ্টাও চলছে। পাশাপাশি গভীর নিষ্ঠার সাথে নানা আজগুবি ও সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক তথ্য দিয়ে মূলতঃ চাকমা জাতি সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। এসব কাজে বহু অর্থ, মেধা ও শ্রমের বিনিয়োগ হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। এদেশে চরম মৌলবাদী ও আদিবাসী বিদ্বেষী কিছু গবেষকও ইতোমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে। উপরোক্ত প্রচার মাধ্যমগুলোতে তারা আদিবাসী নারী ও তরুণ প্রজন্মের বিরুদ্ধে নেতিবাচক ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ নানা প্রচারণা চালাচ্ছেন। সেখানে স্থানীয় ফ্লেভারযুক্ত বিভিন্ন প্রলোভন, রগরগে প্রেম ও সহিংসতার কাহিনীও ছড়ানো হচ্ছে। আসলে এটি শাসকগোষ্ঠীরই পরিকল্পিত এক ধরনের অতি নোংরা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। আদিবাসী ভবিষ্যত প্রজন্মের একটি ভোগবাদী, স্বার্থপর, জীবন ও রাজনীতি বিমুখ মানস-কাঠামো গড়ে দেওয়াই এর লক্ষ্য। এসব কাজের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের প্যালেস্টাইন-ইজরায়েল সংঘাতের অদ্ভুত মিল। সেখানে ইহুদি এবং পশ্চিমা কর্পোরেট মিডিয়া বিশ্ববাসীর সামনে ফিলিস্তিনী শিশু-তরুণদেরকে প্রতিনিয়ত উচ্ছৃঙ্খল সন্ত্রাসী হিসেবে উপস্থাপন করছে। টিভির পর্দায় প্রায়শঃ দেখানো হয়, ফিলিস্তিনী শিশু-তরুণেরা সবসময় ইজরায়েলি সেনাদের লক্ষ করে পাথর বা গুলতি ছুঁড়ছে; বয়স্ক নারী-পুরুষেরা কোন শবদেহ কাঁধে নিয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। এভাবে পশ্চিমা স্বার্থের অনুগত বহুজাতিক কর্পোরেট মিডিয়া প্রমাণ করতে চায় এসব উচ্ছৃঙ্খল, যুদ্ধবাজ মানুষদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার ইজরায়েলের আছে। সুতরাং নির্দিষ্ট বিরতিতে ফিলিস্তিনীদের ভূখণ্ড দখল করে বসতি স্থাপন, কট্টরপন্থীদের বিদ্রোহ দমনের নামে সাধারণ মানুষকে হত্যা করা ইজরায়েলের জন্য জায়েজ। পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায়ও কি অতি সূক্ষ্মভাবে প্রায় অনুরূপ একটি জাতিগত আগ্রাসন এখন চলছে না? আসলে স্থানিক ভিন্নতা ছাড়া ইজরায়েলি আগ্রাসন আর পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান সামরিক-সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নেই। প্যালেস্টাইনে সেটি চলছে ইহুদিদের অতি প্রাচীন পবিত্র রাজধানী ও ধর্মীয় ঐতিহ্য উদ্ধারের নামে। আর পার্বত্য চট্টগ্রামে এই আগ্রাসন চালানো হচ্ছে প্রতিবেশি বিধর্মী রাষ্ট্রের হাত থেকে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষাসহ এই অঞ্চলে পশ্চিমাদের 'খ্রিস্টান রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রকে প্রতিরোধের নামে বাঙালি একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।

এযাবৎ বস্তুগত ও মননগত সব সম্পদ হরণের মাধ্যমে হীনম্মন্যতাবোধে আক্রান্ত করার একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় সারা বিশ্বজুড়ে ভিন্নতর প্রান্তিক জাতিসমূহের উপর অধিপতি জাতির ভূ-রাজনৈতিক ও আর্থ-সাংস্কৃতিক উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হয়ে এসেছে। দুর্বল ও প্রান্তিক জাতির ভূমি, নারী, প্রকৃতি, সংস্কৃতি এবং খনিজ বা জলজ সকল সম্পদ একসময় বিজয়ীর ভোগদখলে চলে যায়, যদি তারা নিজ জাতির অহংকারের, আত্মমর্যাদার বিষয়গুলোকে আঁকড়ে ধরে আগ্রাসী শক্তিকে প্রতিহত করতে না পারে। সবলের কাছে দুর্বলের এই আত্মসমর্পিত হওয়া প্রসঙ্গে উত্তর-উপনিবেশী তাত্ত্বিক ফ্রানৎস ফাঁনো বলেছেন, ভৌগলিক উপনিবেশের চেয়ে মনের উপর উপনিবেশের প্রভাব অধিকতর দীর্ঘস্থায়ী ও গভীর হয়ে থাকে। ভূ-রাজনৈতিক উপনিবেশের হাত থেকে একসময় মুক্তি মিললেও মনের উপনিবেশ মুক্তি আর সহজে মেলে না। পার্বত্য চট্টগ্রামেও এখন সেই কাণ্ডটিই ঘটছে। বাঙালির ভূ-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে পাহাড়িদের ভূমি/ বাস্তুসম্পদ যটটুকু বেদখল হচ্ছে তার চেয়ে বেশি বেহাত হয়ে

যাচ্ছে মনের, মননের, সংস্কৃতির জমিন। পাঠক, একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখবেন, গত চার দশকে আমাদের পূর্বপুরুষের ভূমি হারানোর পাশাপাশি মনের দিক থেকে কত ব্যাপকভাবে এবং দ্রুততার সাথে আমরা বদলে গেছি। অর্থাৎ আমাদের মানস সম্পদগুলোকে হারিয়ে ফেলেছি। একদিকে বাঙালি প্রতিবেশি, বাঙালির সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, চলন-বলন, রুচি-স্টাইলের প্রতি অনুকরণপ্রিয়তা ও নির্ভরশীলতা নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত নির্বিশেষে পাহাড়ি সমাজে যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে নিজেদের সমাজে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, মানসিক দূরত্ব ও অবিশ্বাস গভীরতর হয়েছে। বাঙাল-প্রিয়তার দিক থেকে উচ্চবিত্তরা আরও এককাঠি এগিয়ে গেছে। এই মহলে কোথাও কোথাও এখন পাহাড়ি বধুর সাথে বাঙালি বরের সামাজিক বিয়ে মহাধুমধামে আয়োজিত হতে দেখা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী সমাজে খুনীর সংখ্যাও কি দিনদিন বেড়ে চলেছে বা অতি সুকৌশলে মানুষকে খুনী বানানো হচ্ছে? কারণ কিছুদিন পরপরই সেখানে এখন খুনোখুনির ঘটনা ঘটে। দুই দশক আগেও ঢাকাসহ শহরাঞ্চলের রাস্তায় বা গণপরিবহনে কদাচিৎ দুই অপরিচিত আদিবাসী মানুষের সাক্ষাৎ হলে তারা সোৎসাহে পরস্পরের সাথে কুশল বিনিময় করতেন। এক ধরনের গভীর আত্মীয়তা ও নিরাপত্তার বোধ তাদের পরস্পরকে স্পর্শ করতো। এখন আর সেই অকৃত্রিম সহমর্মিতা বা সৌজন্য মানুষকে সেভাবে কাছে টানে না। আদিবাসীদের নিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের নির্মম রাজনীতির খেলা মানসিকভাবে তাদেরকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। ফলে এক জুম্ম ভাই হয়ে অন্য জুম্ম ভাইয়ের বুকে ছুরি বা গুলি চালানো এখন আর খুব কঠিন কাজ নয়। এই 'খুন' খেলা বা খুনীদের সংখ্যা (রাজনীতির ভাষায় সৈনিক, যোদ্ধা যে নামে অভিহিত করা হোক না কেন) আদিবাসী সমাজে যত বাড়বে ততই শাসক জাতির আধিপত্য সুদৃঢ় হবে। একসময় হয়তো দেখা যাবে, উচ্ছৃঙ্খল 'উপজাতি'দেরকে নতুনভাবে মানবাধিকারের পাঠ দানের নামে বিদেশী কিংবা স্বদেশী অর্থায়নে বিভিন্ন 'মানবাধিকার' প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, একের পর এক পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক হামলা, খুন, ধর্ষণের মতো সহিংস ঘটনা ঘটিয়ে আদিবাসী মানুষের সংবেদনশীলতা বা চেতনাকে ভোঁতা বানিয়ে দেওয়ায় প্রয়াস চলছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, এসব সাম্প্রদায়িক আক্রমণ এখন যেন দেশের কোন সড়ক দুর্ঘটনা, ভবন ধ্বসে গার্মেন্টস শ্রমিকদের গণমৃত্যু কিংবা আফ্রিকার জঙ্গলে কোন চিতার হরিণশাবক শিকারের মতো স্বাভাবিক ঘটনা। কিছুদিন হৈ হল্লার পর সবকিছু কেমন যেন আগের মতো গা সওয়া, স্বাভাবিক হয়ে যায়। মানুষকে বুঝতে দেওয়া হয় না যে, এসব ঘটনা সামরিক-সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বা শাসকগোষ্ঠীর 'এথনিক ক্লিনজিং' এর অংশ। সাম্প্রদায়িক আক্রমণ সংঘটিত হওয়ার পর দেখা যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে যেন সবাই এক কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে। সামরিক-বেসামরিক কর্তৃপক্ষ, সুশীল সমাজ, মিডিয়ার কর্তাব্যক্তি সবার মধ্যে যেন একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় কে আগে ঘরপোড়া, বাস্তুহারা মানুষকে ত্রাণসামগ্রী দেবে, তা নিয়ে। তাদের এসব জনদরদি কর্মকাণ্ড মিডিয়ায় গুরুত্বের সাথে প্রচারিত হচ্ছে কিনা সেদিকেও নিশ্চয় তাদের নেকনজর থাকে। ক্ষতিগ্রস্তদের দুঃখ ভুলিয়ে দেওয়ার জন্যে কখনওবা মহাধুমধামে পাঁচমিশেলি

নৃত্য-বাদ্য-গানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আয়োজিত হয়। আদিবাসীরাসহ দেশের সাধারণ মানুষ ও বহির্বিশ্ব নিপীড়কের এই 'মহানুভবতা' দেখে নিশ্চয়ই একটু আশ্বস্ত হয় এই ভেবে যে, দুর্ঘটনাক্রমে এবারের সহিংসতাটি ঘটলেও ভবিষ্যতে আর নিশ্চয় সেরকমটি হবে না! এভাবে একেকটি হামলা চালানোর পর যথারীতি একই নাটক মঞ্চস্থ হয় এবং একসময় ক্ষতিগ্রস্তরা সেটিকে তাদের জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা বলে মেনে নেয়। সর্প-ওঝার বহুরূপী চরিত্রের এই নাটক এখন সারা পৃথিবী জুড়ে উত্তর-উপনিবেশী জাতিগত আগ্রাসনের ট্রেডমার্ক চিত্র। একই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীও এখন আদিবাসীদের এই বিভ্রান্ত, সম্মোহিত ও জীবন্মৃত অবস্থাটিকেই মনে প্রাণে দেখতে চায়।

আইনের শাসনের অভাবে সমাজে খুন, ধর্ষণের মতো সহিংসতা ও নির্লিপ্ততার সংস্কৃতি সর্বস্তরে সংক্রমিত হচ্ছে। আর যে কোন যুদ্ধ, সহিংসতা যা সমূলে বিনষ্ট করে দেয় সেটি হলো মানুষের বিবেক ও মানবিকতা। পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত ও বিচার-রহীনতার সংস্কৃতি জিইয়ে রেখে শাসকগোষ্ঠী আদিবাসী সমাজের নৈতিক-আদর্শিক মেরুদণ্ডকে চিরতরে ভেঙে দিতে চায়, যাতে এই জাতি মেধা-মননে-মানবিকতায় আর কোনদিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারে। প্রেক্ষাপট একটু ভিন্ন হলেও পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীও ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বুদ্ধিজীবী হত্যার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিকে তাই করতে চেয়েছিল। শহীদ বুদ্ধিজীবীরা বেঁচে থাকলে বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতি আজ এত সহিংস, ভোগসর্বস্ব নিশ্চয় হতো না। মেধা-মননে পঙ্গু করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানীরা বাঙালিকে শারীরিকভাবে হত্যা করেছে, আর সেই বাঙালি শাসনক্ষমতা পেয়ে এখন হত্যা করছে আদিবাসীর দেহ, মন উভয়কে। কখনও সরবে, কখনও নীরবে। বিশ্ব মিডিয়া ও মানবাধিকার কর্মীদের শ্যেন দৃষ্টি না থাকলে এই নিধন প্রক্রিয়া হয়তো অচিরেই পাকিস্তানীদের মতো গণবিধ্বংসী হয়ে উঠতো। যা'হোক, এভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে একটি 'নীতি-বিসর্জিত, আত্মঘাতী ও বিভক্ত আদিবাসী সমাজ' এই মানবাধিকারের যুগে কীভাবে স্বমহিমায়, সগৌরবে টিকে থাকবে সেটি এক বড় প্রশ্ন। শাসকগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান আগ্রাসনের প্রেক্ষাপটে নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থে এই বিষয়গুলোর প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়ার সময় কি এখন আসেনি? কবে আমরা উপজাতীয় গোষ্ঠীগত অহংকার, অপরিণামদর্শিতা আর বদমেজাজ লালনের পরিবর্তে আপাদমস্তক আধুনিক, মানবাধিকারবাদী, গণতান্ত্রিক এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি সাবালক জাতির মতো আচরণ করবো?

আদিবাসীদের ভূমি অধিকার বনাম রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব

অধিপতি জাতি তার নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ডের সপক্ষে সবসময় কোন না কোন দর্শন বা যুক্তি উপস্থাপন করে থাকে। আদিবাসীরা পাহাড়ে সমতলে নিজেদের পূর্বপুরুষের প্রথাগত ভূমি-বন জবরদখল হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে দেশের সুশীল সমাজের একটি অংশকে (মূলতঃ এনজিও) নিয়ে বহুদিন ধরে মৃদুমন্দ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে এই এনজিওদের দাবি যাই হোক

না কেন, আদিবাসীদের ভূমি-বিচ্ছিন্নতা, ভূমিকেন্দ্রিক মিথ্যা মামলার বোঝা ও হয়রানি, আদিবাসী নারীর উপর যৌন নিপীড়ন ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতার মাত্রা বাড়ছে বই কমছে না।

অন্যদিকে এনজিওনির্ভর আদিবাসী ভূমি আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য শাসকগোষ্ঠীর হাতে রয়েছে একটি শক্তিশালী মারণাস্ত্র। সেটি হলো, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার তত্ত্ব। দেশের সুশীল সমাজও মূলতঃ শাসকগোষ্ঠী এবং সমাজের উপরতলার অংশ বলে তাদের অনেকে জাতীয়তাবাদ, ধর্ম, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার প্রশ্নে বিভ্রান্ত, দ্বিধাবিভক্ত এবং শাসক মহলের অনুগামী। আদিবাসীরা যে 'বহিরাগত, বাঙালিদের মতো দেশদরদি বা বিশ্বস্ত নয় এবং সুযোগ পেলে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করে দিতে পারে' সে আশংকা প্রমাণ করতে রাষ্ট্রযন্ত্র এবং অনুগামী কর্পোরেট মিডিয়া নানা উস্কানিমূলক সাম্প্রদায়িক প্রচারণা নিজ নাগরিকদের বিরুদ্ধে চালিয়ে যাচ্ছে। আদিবাসী-বৈরী এই দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে অনেক 'সুশীল'ও উপরে উল্লেখিত কারণে নৈতিকভাবে দুর্বল এবং আপসকামী। তাই থেমে থেমে আদিবাসী নিধন বা বিতাড়নের ঘটনা ঘটলেও তারা রাষ্ট্রযন্ত্রের আদিবাসী বিদ্বেষী ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সাথে রুখে দাঁড়াতে পারেন না।

আদিবাসী বর্জিত এই একপেশে ও ভ্রান্ত সার্বভৌমত্ব তত্ত্বের কারণেই বাংলাদেশের প্রান্তিক মানুষেরা এথনোসাইডের শিকার হচ্ছেন। এক্ষেত্রে সহজতম উপায় হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে তাদের ভূমি জবরদখল এবং নারীদের উপর যৌন নিপীড়নকে। শুধু ভূমি বা অন্যান্য সম্পদের উপর বৃহৎ নৃ-গোষ্ঠীর কিছু মানুষের লোভ ভেবে বিষয়টিকে সাধারণীকরণ করার সুযোগ নেই। অবচেতনে আদিবাসী বা হিন্দু-বিদ্বেষ না থাকলে তাদের ভূমি-নারীর উপর সংখ্যাগুরু মানুষের শোষণ এত প্রবলভাবে কায়েম হতো না। পাহাড়ের ক্ষেত্রে আদিবাসী নির্মূলীকরণের অংশ হিসেবে প্রকৃতি-ভূমি-সংস্কৃতি বেদখলসহ সেনাকর্তৃত্ব এবং মুসলিম বাঙালির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রকাশ্য ও গোপন তৎপরতা তো সবার জানা। নতুন উৎপাত হিসেবে এখন যুক্ত হয়েছে 'হিন্দু ভারত' ও 'বৌদ্ধ মিয়ানমার'-এর সম্ভাব্য আগ্রাসন এবং পশ্চিমা বিশ্বের 'খ্রিস্টান রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার কল্পিত ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার কিম্ভূত তত্ত্ব। এর অংশ হিসেবে বিভিন্ন গণমাধ্যমে জুম্ম বিদ্বেষী প্রচারণার পাশাপাশি বাঙালি জাতিকে 'আদিবাসী' প্রমাণের জোর প্রচেষ্টাও চলছে, যা আগে উল্লেখ করেছি। তাই শুধু ভূমি চাই, ভূমি চাই বলে চিৎকার করে আদিবাসীদের সমস্যার সমাধান হবে না। সত্য কথাটি খোলাসা করে বলার সময় এসেছে। আসলে প্রতিবেশি দেশের কল্পিত আগ্রাসন বা পশ্চিমাদের দূরভিসন্ধি প্রতিহতের নামে পাহাড়কে মুসলিম বাঙালির অবাধ চারণভূমি ও বর্মে পরিণত করাই হলো আসল লক্ষ্য। এর জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে সেটেলার বাঙালিদের পুনর্বাসনসহ যা যা প্রয়োজন তা করতে টনটনে সার্বভৌমত্বপন্থীরা পিছপা হবেন না। মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রো ডলারের সহায়তায় পার্বত্য চট্টগ্রামসহ ভারতের আসাম-মেঘালয়ের কিছু অংশ এবং মিয়ানমারের আরাকানকে নিয়ে সুদূর ভবিষ্যতে শরিয়া আদর্শের একটি 'ইসলামিক

রিপাবলিক' গড়ার খায়েশও তাদের অনেকের মনে আছে বলে প্রকাশ। এসব লক্ষ্য পূরণে এথনিক ক্লিনজিং এর অংশ হিসেবে আদিবাসীদের ভূমি-নারী-সংস্কৃতি-অর্থনীতিকে আত্মীকরণের কথা আগে বলা হয়েছে। পরবর্তী ধাপে এখন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বের ভেতরে বিভাজন সৃষ্টি, টার্গেটেড কিলিং, গোপনে স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্যহানি ও বন্ধ্যাকরণ এবং আদিবাসীদের গৌরব ও অহংকারের সব বিষয়কে কলুষিত ও প্রশ্নবিদ্ধ করার কাজটি চলছে। এছাড়া ঘুষ-দুর্নীতি-মাদকদ্রব্য-চাঁদাবাজিকে প্রশ্রয় দান ও প্রসারের মাধ্যমে নৈতিক অবক্ষয়কে ত্বরান্বিতকরণ, প্রতিবাদী যুবসমাজকে (নারী-পুরুষ নির্বিশেষে) ভোগবাদিতায় প্রলুব্ধ করে চরিত্রহীনতা ও নির্লিপ্ততায় ডুবিয়ে দেওয়ার কাজও প্রায় সম্পন্ন। এরপর আছে শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের মাধ্যমে আদিবাসীদের দেহ-মনের সমুদয় শক্তি, মুক্তবুদ্ধি এবং সমতার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে নিঃশেষ করার আয়োজন। সবশেষে মূলধারার সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে আদিবাসীদের দেহ-মনের উপর বাঙালির শ্রেষ্ঠত্ব এবং ভৌগলিক-মানসিক-সাংস্কৃতিক উপনিবেশকে চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজটি সম্পন্ন হবে। সমতলের বিভিন্ন আদিবাসী অঞ্চলে এবং বিশেষ করে পাহাড়ে সামরিক-বেসামরিক ব্যবস্থাপনায় উপরে উল্লেখিত নিপীড়ন প্রক্রিয়াসমূহের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে। ফলে নতুন নতুন রাস্তাঘাট, পর্যটন কেন্দ্রের চাকচিক্য দেখে আপাতঃ উন্নয়নের গোলকধাঁধায় বিভ্রান্ত হয়ে আদিবাসীরা নিজেদের অজান্তে দিন দিন প্রান্তিক অবস্থানে চলে যাচ্ছেন। রাষ্ট্রযন্ত্রের সুপরিকল্পিত সামরিক-সাংস্কৃতিক-মনস্তাত্ত্বিক আগ্রাসনের কুফল আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা কি এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি না? ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতে আমাদের জনসংখ্যা এবং সুশিক্ষিত জনশক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। সমাজে হিংসা-হানাহানি এবং আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও দূরত্ব বেড়েছে। মানুষে মানুষে অবিশ্বাস ও সন্দেহপ্রবণতা বাড়ছে। সমাজে দুর্নীতি ও নৈতিক অবক্ষয় দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। তরুণ-তরুণীদের একটি বিরাট অংশ আজ মাদকাশক্ত, জীবন ও রাজনীতিবিমুখ। বাকিরাও মূলতঃ শেকড় বিচ্ছিন্ন এবং আধুনিক ভোগবাদিতার গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। আদিবাসীদের সংগ্রামী ঐতিহ্য, গৌরবগাথায় তারা আর তেমন গর্বিত, উজ্জীবিত হন না। স্বজাতির জন্য অহংবোধ, মেধা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চাও সমাজে যেন দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। নানা মনস্তাত্ত্বিক, আর্থ-সাংস্কৃতিক কারণে একশ্রেণীর তরুণী এখন শারীরিকভাবেও পাহাড়ি-বাঙালির ভেদাভেদ যেন ঘুচিয়ে দিয়েছে। সকল আদিবাসী রাজনীতিবিদ, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দও আজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন কিংবা শত্রুভাবাপন্ন। নিজেদের প্রায় সকল কাজে তারা আজ যেন বাঙালি নেতৃবৃন্দ ও প্রশাসনের উপর নির্ভরশীল বা আস্থাশীল। তাহলে আদিবাসী/শোষিতের দেহ-মনের উপর বাঙালি বা শোষকের ভূ-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপনিবেশ তো ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েই আছে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, বেগম খালেদা জিয়া, এরশাদ এবং আওয়ামী লীগের সরকার সকলে উপরে আলোচিত পদ্ধতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের আদিবাসী অঞ্চলে মুসলিম বাঙালির আধিপত্য বিস্তারের কাজটি নিপুণভাবে করে গেছে। এখন শুধু 'ভাগ কর, শাসন কর' নীতির ভিত্তিতে আদিবাসীদের দিয়ে আদিবাসী নির্মূলীকরণের শেষ

আয়োজনটুকু সম্পন্ন হতে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন আর সেনাবাহিনীকে 'বিপথগামী বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী শান্তিবাহিনী'র খোঁজে কষ্ট করে বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে হয় না। এক সময়ের কট্টর জুম্ম জাতীয়তাবাদী সশস্ত্র যোদ্ধারাই এখন কৃত্রিমভাবে আরোপিত বিভাজন রেখা ধরে নিজের সহযোদ্ধা ভাইকে গ্রাম-শহর-অরণ্যে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বিজাতীয় সেনাদের চেয়েও নিষ্ঠুরভাবে নিশ্চিহ্ন করছে। কখনও আদর্শের নামে, কখনও স্রেফ ক্ষমতার দাপট প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে। নিজেরাই যদি নিজেদেরকে এভাবে শেষ করে দেবো তাহলে আর স্বতন্ত্র জাতীয় পরিচয় বা নিজেদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির পক্ষে সংগ্রামের বুলি আওড়িয়ে কী লাভ? কেনই বা হাজার হাজার মানুষকে উদ্বাস্তু, শরণার্থী বানিয়ে অনিশ্চিত জীবনের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল (যাদের অনেকে আজও সহায়-সম্বলহীন)? কেন জুম্ম জাতীয়তাবাদের জনক, নিপীড়িত মানুষের অবিসংবাদিত নেতা এম. এন. লারমাসহ হাজারো মানুষ যুদ্ধে, গণহত্যায় নির্বিচারে আত্মাহুতি দিলেন? তাদের আত্মত্যাগকে, স্বপ্নকে কী আমরা সম্মান জানাবো না? তাঁরা কি শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর বিনামূল্যের নিউজপ্রিন্ট কাগজের বুলেটিনে কিংবা এনজিও অর্থানুকূল্যে আয়োজিত কৃত্রিম স্মরণসভায় 'সাম্প্রদায়িক সংঘাতে' নিহত ব্যক্তিদের তালিকা হয়ে থাকবেন? তাঁদের এবং আমাদের অকুতোভয় সংগ্রামী পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তির জন্যে, আগামী প্রজন্মের নিরাপদ সুখী ভবিষ্যত নিশ্চিত করার প্রত্যয়ে সব ভেদাভেদ-ঘৃণা-বিদ্বেষ-অভিযোগ ভুলে আমরা আবারও একবার ঐক্যবদ্ধ হবো না?

আদিবাসীদের বিপন্নতা বনাম নানা বর্ণের বাঙালি জাতীয়তাবাদ

আগেই বলেছি, ইদানীং বিভিন্ন ওয়েবসাইট, ব্লগে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও দেশের আদিবাসী বিষয়ে বহু লেখক, গবেষক ও ভূ-রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞের রচনা চোখে পড়ে। তারা প্রায় সকলে একবাক্যে ভূমির অপ্রতুলতা বা ভূমি হারানোকে আদিবাসীদের বর্তমান দুরবস্থার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়ের রচনায়ও সেটি আলোচিত হতে দেখা যায়। পারতপক্ষে শুধুমাত্র মুসলিম বাঙালিদের জন্য দেশের সংবিধানের একক সত্ত্বাবিশিষ্ট সর্বগ্রাসী বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং সে লক্ষ্যে আদিবাসী বিদ্বেষী সেনাকর্তৃত্বের সমন্বয়ে 'হিন্দু ভারতের' প্রভাবমুক্ত একটি 'নিরাপদ রাষ্ট্র' টিকিয়ে রাখাই যে দেশের নীতি নির্ধারণী প্রভাবশালী মহলের মূল উদ্দেশ্য সেটি এসব রচনায় আলোচিত হয় না। এই কিম্ভূত রাষ্ট্রীয় দর্শন বা স্বপ্নকে বাস্তবায়নের পথে 'ভারত অনুরাগী' বা ধর্মীয় বিশ্বাসে 'অপর' সকল জাতিসত্তা ও সম্প্রদায়কে নিয়ে এক ধরনের অস্বস্তি বা আক্রোশ তো মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের থাকবেই। অনুদার এই রাষ্ট্রীয় দর্শনের চোরাবালিতে এখন প্রায় বিলীয়মান অবস্থায় হাবুডুবু খাচ্ছেন বাংলাদেশের তাবৎ আদিবাসী মানুষ ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী। এখানে শুধু বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু ও বাঙালি বৌদ্ধদের বিষয়টি একটু আলাদাভাবে উল্লেখ করছি। আদিবাসীদের মতো এপার বাংলার রাজনীতিতে এই দুই সম্প্রদায়ও আজ সত্যি বড়ো বিভ্রান্ত ও দ্বিধাবিভক্ত জনগোষ্ঠী। বাঙালি হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ জানেন না, ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত

থাকা সত্ত্বেও কেন তাদের ভিটেমাটি, উপাসনালয় নির্বিচারে আক্রান্ত হয়। তাদের ব্যবসাপাতি ও সাজানো সংসার পুড়ে ছাড়খার হয়ে যায়। একই বিভ্রান্তির কারণে বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি বিরাট অংশ আবার বিএনপি (প্রকারান্তরে জামায়াত)-এর তুখোর সমর্থক এবং ভোটব্যাংক। মূলতঃ তাদের নেতৃত্বের দুর্বলতা বা পারস্পরিক স্বার্থদ্বন্দ্ব এই বিভক্তির জন্য দায়ী। আওয়ামী ঘেঁষা হিন্দু ও বৌদ্ধ ভোটাররা মনে করেন তাঁদের নেত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা একজন অসাম্প্রদায়িক মানুষ, সুতরাং তাঁর নেতৃত্বাধীন অওয়ামী লীগও একটি অসাম্প্রদায়িক ও সংখ্যালঘুদরদী দল। কিন্তু তাদের নেত্রীকেও যে দেশের অতি ক্ষমতাধর সশস্ত্র মহলবিশেষ, মৌলবাদী ভোটব্যাংক, বিদেশী ত্রাতা বা শুভাকাঙ্ক্ষীদের নানা স্বার্থসংশ্লিষ্ট চাপ মোকাবিলা করে সবার জন্য আপাতঃ গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হয় সেটি অনেকে হয়তো বুঝতে চান না। হিন্দুরা জানেন, ধর্মনিরপেক্ষ বা হিন্দু ভারতই তো বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বাধিক সহায়তা দিয়েছে। সুতরাং তারাও দেশের সাধারণ মানুষ তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগোষ্ঠীর মতো সমান ক্ষমতায়িত বা স্বাধীন। তারা হয়তো ভাবেন, সংবিধানের বাঙালি জাতীয়তাবাদ মানে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান বাঙালির সমানাধিকারের জাতীয়তাবাদ কিংবা হিন্দু বাঙালির কিঞ্চিত প্রাধান্যযুক্ত জাতীয়তাবাদ। কারণ একসময় শিক্ষা-দীক্ষায়, বাণিজ্যে-বিজ্ঞানে হিন্দু বাঙালি সত্যিই মুসলিম বাঙালির পথপ্রদর্শক ছিল। প্রবীণদের দ্বারা প্রভাবিত হিন্দু সমাজ আজও হয়তো অনুরূপ ফ্যান্টাসিতে ভুগছে। বাস্তবে সেক্যুলার শিক্ষায় শিক্ষিত বয়োজ্যেষ্ঠ কতিপয় নেতা-নেত্রী বাদে আওয়ামী লীগ দলটিও যে অতি মুনাফালোভী নব্য মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের কব্জায় একপ্রকার বন্দী হয়ে পড়েছে তা অনেকে বুঝতে চান না। আওয়ামী লীগকে তার গণতন্ত্র, সমতা, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসাটাই এখন আওয়ামী লীগের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর যারা বিএনপি করেন তারা হয়তো দলের সুবিধাভোগী নেতার অনুসারী হয়েই তা করেন। নেতা হয়তো বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে সত্যিই তাদের নিরাপত্তা বিধান করতে পারেন। সুতরাং একদিকে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব অন্যদিকে নিরাপত্তাহীনতার বোধ - এই দুইয়ের সংমিশ্রিত ও দ্বান্দ্বিক মনস্তত্ত্বই বাংলাদেশের হিন্দু (কিছু ক্ষেত্রে বাঙালি বৌদ্ধ) সমাজকে যুগপৎ আওয়ামী লীগ-বিএনপি এই দুই শিবিরে বিভক্ত করেছে বলে প্রতীয়মান হয়। এনজিওতে কর্মরত হিন্দু সম্প্রদায়ের এক তরুণী কর্মকর্তা এই লেখককে একদিন বলেছিলেন, 'বাংলাদেশে মুসলমান ভাইয়েরাই তো আমাদের নিরাপত্তা'। অনুরূপভাবে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে কর্মরত হিন্দু সম্প্রদায়ের একজন তুখোড় এনজিও নেত্রী ঢাকায় বিদেশী দাতা পরিবেষ্টিত প্রকাশ্য সভায় বলেছিলেন, 'উপজাতিরা বাংলার খায়-দায়, বাংলায় কথা বলে, নানা সুযোগ-সুবিধা নেয়; অথচ বাঙালি হতে চায় না। এটি তো দেশের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা এবং নিন্দনীয় ব্যাপার'। এই 'মহিয়সী' হিন্দু রমণীর কাছে বাংলাদেশ ও বাঙালি সমার্থক। অর্থাৎ উপমহাদেশের হাজার বছরের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ধারক-বাহক হয়েও তিনি একটি দেশের বহুজাতি, বহু সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত সমানাধিকারের সৌন্দর্যকে অনুধাবনে অক্ষম। তেমনি আরেকজন সুপ্রতিষ্ঠিত মিডিয়া ব্যক্তিত্বকে পেয়েছিলাম যে

ভদ্রলোক (হিন্দু) নিজের স্বপ্নের বাংলোতে বসে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য উপভোগ করবেন বলে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি যুৎসই পাহাড় বা জমি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, প্রথমজন বিএনপির তুখোর সমর্থক এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়জন আওয়ামী লীগের। দ্বিতীয়জনের কথার প্রতিবাদ অবশ্য আমাকে করতে হয়নি। একজন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত প্রগতিশীল মুসলিম (মানুষকে ধর্মীয় পরিচয়ে চিহ্নিত করতে আমি কুণ্ঠিত) তরুণই সেদিন সবার সামনে তার কুশিক্ষাজনিত ভুল ভাঙিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং সর্বগ্রাসী বাঙালি জাতীয়তাবাদী আগ্রাসনের ভয় শুধুমাত্র মুসলমান বাঙালির তরফ থেকে নয়; বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি বৌদ্ধরাও অনুকূল পরিস্থিতি সাপেক্ষে সমান আগ্রাসী হয়ে উঠতে পারেন। দুঃখজনক সত্য হলেও দেখা গেছে, পাহাড়ের বাঙালি হিন্দু এবং বাঙালি বৌদ্ধরাও (যাদের সাথে একসময় আদিবাসীদের গভীর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, যা অঞ্চল বিশেষে কোথাও কোথাও এখনও টিকে আছে) অবস্থা বুঝে আদিবাসী বিদ্বেষের অনুকূল লাভজনক স্রোতে নির্দ্বিধায় গা ভাসিয়ে দেন। তাই অবস্থাভেদে সম্পর্কের পারদ ওঠানামা করলেও সামগ্রিকভাবে আদিবাসীদের উপর বাঙালি জাতীয়তাবাদের সম্মিলিত আগ্রাসী তৎপরতা অদূর ভবিষ্যতে হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি নেই।

কেন চাকমা জনগোষ্ঠীকে আলাদাভাবে টার্গেট করা হচ্ছে?

বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি নানা মহল, অভিজাত ও সাধারণ লোকজনের কথাবার্তায় আজকাল চাকমা বিদ্বেষী এবং ঈর্ষাকাতর বহু বক্তব্য শোনা যায়। দুই দশক আগেও যে চাকমা জাতি সম্পর্কে সাধারণ বাঙালি মানসে উপজাতি, আদিম, বর্বর হিসেবে একধরনের তাচ্ছিল্যের আসন পাকাপোক্ত ছিল সেই চাকমারা কোন জাদুমন্ত্রবলে আজ এতোখানি (বাঙাল-বিবেচনায়) উন্নত, সভ্য এবং দেশের প্রচলিত কোটাব্যবস্থার অনুপযুক্ত হয়ে গেল তা বোধগম্য নয়। কারণ চাকমাদের জন্য কোটার প্রয়োজন নেই এমন দাবিও এখন শোনা যাচ্ছে। আসলে 'এথনিক ক্লিনজিং' বা নিঃস্বায়নের জন্য যে নয়া-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় প্রকল্প এদেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে তার প্রেক্ষিতে নতুন ও সুক্ষ্ম এই ষড়যন্ত্রের তৎপরতাগুলোকে বুঝতে হবে। বলাবাহুল্য, নানা ভ্রান্ত সমীকরণ ও স্বার্থদ্বন্দ্বে দল-উপদলে বিভক্ত বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ও আদিবাসী সমাজে চাকমারা এতোদিন সত্যিই তাদের ব্যতিক্রমী একীভূত অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। সে কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম স্বাধিকারের সংগ্রাম একসময় মুকুলিত হতে পেরেছিল। এই সংগ্রাম আজও বাংলাদেশের সকল মুক্তিকামী আদিবাসী, এমনকি বহু প্রগতিশীল বাঙালির কাছেও আরাধ্য সম্পদ। বিশ্বের জাতিগোষ্ঠীগত বিপ্লবের ইতিহাসেও জুম্মদের বিদ্রোহ একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। সে কারণে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিদ্রোহী জনসংহতি সমিতির সাথে চুক্তিতে উপনীত হওয়ার পর ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার লাভ করেছিলেন। নানা আঞ্চলিক দল উপদলে বিভক্ত হওয়ার কারণে পার্বত্য আদিবাসীদের ইতিবাচক ভাবমূর্তি এখন কিছুটা ক্ষুন্ন হলেও জাতিগত শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ দেশে বিদেশে স্বীকৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, আদিবাসী জুম্মদের এই সংগ্রামকে, সংগ্রামের গৌরবময় অর্জনকে কেন আজ চাকমাদের

বাড়বাড়ন্ত বা 'ষড়যন্ত্র' বলে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার আয়োজন চলছে? এর পেছনের রাজনীতিকে অবশ্যই আমাদের বুঝতে হবে, উপরে আলোচিত মায়োপীয় রাষ্ট্রীয় দর্শনের আলোকে।

এই বঙ্গদেশসহ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন প্রায় দু'শ বছর ধরে বহাল ছিল। সেই দীর্ঘ শাসনামলে ব্রিটিশরা চাকমা জাতিকে খ্রীস্টধর্মে দিক্ষিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি। লুসাই, ম্রো, মিজো, গারো, নাগা, খাসি, সান্তালসহ বাংলাদেশ এবং অবিভক্ত ভারতের অনেক জাতিগোষ্ঠীকে অতি সহজে তারা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছে। চাকমা জাতির ক্ষেত্রে কেন তারা সফল হতে পারেনি সেটি নির্মোহ দৃষ্টিতে বিবেচনার দাবি রাখে। ছোটবেলায় মিজো জাতির মানুষকে খ্রিস্টধর্মের অনুগামী করার জন্য ব্রিটিশ সেনাপতিকে কি ধরনের কুটকৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছিল তার গল্প গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখে শুনেছি। ব্রিটিশ সেনাপতি মিজো সমাজের 'লালফা'র হাতে তার গুলিভর্তি রাইফেল (আসলে বারুদ ছাড়া সেখানে কোন গুলি ছিল না) তুলে দিয়ে বলেছিলেন, 'চালাও, আমাকে গুলি করো।' সেই 'লালফা' দেখলেন, একের পর এক জলজ্যান্ত গুলি ছোঁড়ার পরেও ব্রিটিশ সেনা কুপোকাত হয় না; শুধু যীশু, গড ইত্যাদি শব্দ বলে ধ্যানস্থ হয়ে যায়। এভাবেই হয়তো ব্রিটিশরা তাদের নানা চাতুর্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক শক্তি জাহির করে একসময় মিজোসহ অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে সহজে বশীভূত করতে সক্ষম হয়েছিল। অন্যদিকে চাকমাদের বেলায় ঘটেছে ঠিক তার উল্টো। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তারা রীতিমত চারবার যুদ্ধ করেছে। চাকমাদের মহিয়সী রাণী কালিন্দী ব্রিটিশদেরকে 'সাদা বাঁদর' বলতেও কুণ্ঠিত হননি এবং ব্রিটিশ রাজের প্রতিনিধিকে তার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি পর্যন্ত দেননি। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ তো অনেক দূরের ব্যাপার। গ্রামের বয়স্কদের মুখে শোনা একটি গল্প বলি। খ্রিস্টীয় যাজকদের প্রচারণা ও প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে চাকমাদের কেউ কেউ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। যেদিন তাদের দীক্ষা হয় ঠিক তার পরের দিন মলিন মুখে বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে কিংবা গৃহের একপাশে সযতনে রাখা বুদ্ধমূর্তির সামনে আনত হয়ে তাদেরকে প্রার্থনা করতে শোনা যায়, 'হে পরম করুণাময় বুদ্ধ, তুমি আমায় ক্ষমা করো; আমি দারিদ্রের কারণে, নানা প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার অভিনয় করেছি, সাময়িক এই বিচ্যুতির জন্য আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমাকে পুনরায় গ্রহণ করো' ইত্যাদি। এই হলো চাকমাদের ধর্মবিশ্বাস, যা তাদের উৎপত্তির ইতিহাসের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ। চাকমাদের বদ্ধমূল বিশ্বাস, তারা মহামানব গৌতম বুদ্ধের বংশধর। এই অকৃত্রিম বিশ্বাসই হয়তো ধর্মীয় নানা প্রচারণা ও প্রলোভনের এই যুগে তাদেরকে এখনও গৌতম বুদ্ধের গোঁড়া অনুসারী হিসেবে টিকিয়ে রেখেছে।

ধর্মবিশ্বাসে গোঁড়া বৌদ্ধ এই জাতিসত্তা খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী পশ্চিমাদের পাল্লায় পড়ে পার্বত্য অঞ্চলে খ্রিস্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় লালায়িত হবে এমন কল্পনা শুধুমাত্র অপ্রকৃতিস্থ মানুষের পক্ষেই সম্ভব। আর ১২০ কোটি মানুষের পরাশক্তিধর রাষ্ট্র 'হিন্দু' ভারত নিজের নাকের ডগায় এ ধরনের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেবে সেটি মেনে নেওয়া পাগল ছাড়া কারও পক্ষে সম্ভব

নয়। বিশেষ করে যেখানে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অপরাধে ভারতের কোন কোন অঞ্চলে এখনও যাজকদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনা ঘটে। তবে হ্যাঁ, চাকমা জাতির অধিকাংশ মানুষ এখনও নিজেদেরকে হাজার বছরের ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী মনে করে। তাদের কাছে পরম পবিত্র বৌদ্ধ তীর্থগুলোর অধিকাংশ ভারত ভূখণ্ডে পড়েছে, কয়েকটি পড়েছে নেপালে। তাছাড়া চাকমাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ভারতের মিজোরাম, ত্রিপুরা, আসাম, অরুণাচল ও পশ্চিমবঙ্গে অবস্থান করছে। মিজোরামে তো পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক পরিষদের চেয়েও শক্তিশালী একটি স্ব-শাসিত চাকমা জেলা পরিষদ আছে, যার বাজেট ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সরাসরি বরাদ্ধ দেওয়া হয়। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী থেকে শুরু করে সময় সুযোগমতো রাষ্ট্রের রথী-মহারথীদের চাকমা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল পরিদর্শনের রেওয়াজ আছে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী তো একবার মিজোরামের রাজধানী আইজল থেকে নিজে ড্রাইভ করে শত শত মাইলের সর্পিল পাহাড়ি পথ পাড়ি দিয়ে চাকমা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলে পৌঁছেছিলেন বলে প্রচার আছে। আর চাকমা রমণীদের সাথে ঐতিহ্যবাহী পিনোন-হাদি পড়ে দাপুটে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর তোলা সেই উজ্জ্বল ছবিটিতো আজ ইতিহাসের অংশ। বাংলাদেশের বর্তমান ও প্রাক্তন দুই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার সাথে অনুরূপ হৃদ্যতাপূর্ণ মেলামেশার সুযোগ এদেশের চাকমা বা অন্যান্য আদিবাসীদের ভাগ্যে কখনো কি জুটেছে বা জুটবে? তাছাড়া মিজোরামে রাজ্য সরকারের মন্ত্রীসভায় একজন চাকমা জনপ্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার রেওয়াজ বহুদিন ধরে প্রচলিত আছে। ভারত ছাড়াও ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, জাপান, কোরিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্তমানে বহু চাকমা বসতি গেড়েছেন। দেশে বিদেশে চাকমাদের এই অবস্থানের কারণেই কি বাংলাদেশের কোন কোন কায়েমি স্বার্থগোষ্ঠী চাকমাদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসের, কল্পিত বিচ্ছিন্নতাবাদের ধুয়ো তুলছে? বাঙালিরাও তো পৃথিবীর বহু দেশে যুগ যুগ ধরে অবস্থান করছেন। তাহলে একই যুক্তিতে তারাও কি বিচ্ছিন্নতাবাদী, দেশদ্রোহী?

যাই হোক, নিজেদের সমাজের নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও রাষ্ট্রীয় বৈরিতাকে মোকাবিলা করে চাকমাদের নেতৃত্বে (অবশ্য মারমা, ত্রিপুরা নেতৃবৃন্দও ছিলেন) একটি সুসংগঠিত গেরিলা বিদ্রোহ পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিচালিত হয়েছে যার সফল সমাপ্তি ঘটে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের সাথে সম্পাদিত 'শান্তিচুক্তি'র মাধ্যমে। এই বিদ্রোহের সূত্রে পৃথিবীর নানা দেশে চাকমাদের বহু শুভানুধ্যায়ী, বন্ধু-স্বজন বা সমর্থকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে যা তাদের গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার দক্ষতা এবং বর্তমান পৃথিবীতে আধুনিক জাতি হিসেবে তাদের গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, যোগাযোগ দক্ষতা ও কূটনৈতিক সামর্থ্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। এখন বাংলাদেশে বাঙালিদের পরে চাকমারাই অন্যতম প্রধান জাতি যারা আজ পৃথিবী জুড়ে সুপরিচিত। শোনা যায়, ভারতের মিজো, নাগা, খাসি, অহমিয়া বা ত্রিপুরা প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর কাছেও বিশ্বজুড়ে চাকমাদের এই ব্যাপক পরিচিতি নাকি একটি বিস্ময়। তাদের অনেকে সেই প্রশ্ন করে থাকেন। কারণ এসব জাতিসত্তার নিজেদের নামে স্বতন্ত্র রাজ্য এবং বৃহৎ জনসংখ্যা থাকলেও

রাজ্যপাটহীন চাকমাদের নামই নাকি বাইরের জগতে বেশি শোনা যায়। অথচ এদেশে চাকম-ারাসহ প্রায় ৪৫টি অ-বাঙালি হতভাগ্য জাতির সাংবিধানিক স্বীকৃতি আজও অর্জিত হয়নি। সাংবিধানিক এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যিনি সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংসদে দাঁড়িয়ে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তিনি চাকমা জাতি থেকে নির্বাচিত পার্বত্য চট্টগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা প্রয়াত শ্রী এম. এন. লারমা, যার নেতৃত্বে পরে স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আদিবাসীদের স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সূচিত হয়। চাকমাদের এই সংগ্রামী ঐতিহ্য আর ইতোপূর্বে আলোচিত আদিবাসী/সংখ্যালঘু বিদ্বেষী রাষ্ট্রীয় দর্শন ও সার্বভৌমত্ব বিপন্নতার তত্ত্ব সর্বাংশে পরস্পর বিরোধী। সেকারণে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর প্রভাবশালী ও ভারত বিরোধী অংশটি চাকমা জাতিকে শতধাবিভক্ত করে তার সাংগঠনিক ও সৃজনশীলতার শক্তিকে নিঃশেষ করে দিতে সচেষ্ট বলে নানাবিধ তৎপরতায় প্রতীয়মান হয়। ফলশ্রুতিতে আজ চাকমাদের আঞ্চলিক রাজনীতি ত্রি-ধারা বিভক্ত এবং তারা প্রবলভাবে পরস্পরের সশস্ত্র প্রতিপক্ষ। এছাড়া আছে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা বিভাজন। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, বাম দল ও নিরপেক্ষতাবাদীদের হিসেবে ধরলে চাকমা সমাজের রাজনৈতিক শক্তি এখন কমপক্ষে আট থেকে দশ ভাগে খণ্ডিত। তার উপর আছে মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো প্রভৃতি জাতির সাথে চাকমাদের দূরত্ব তৈরির উস্কানিমূলক সরকারি-বেসরকারি তৎপরতা। কারণ এই বিভাজন তৎপরতায় সকল কায়েমি গোষ্ঠীর স্বার্থ নিহিত আছে। চাকমা জাতিকে নিষ্ক্রিয় নিঃশেষিত করা সম্ভব হলে অন্য জাতিগোষ্ঠীকে বাঙালি জাতির মধ্যে আত্মীকৃত করা সহজ হবে। ইতোমধ্যে মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, রাজবংশী প্রভৃতি জাতিসত্তা নাকি চাকমাদের তুলনায় অনেক বেশি বাঙাল-অনুরক্ত বলে নিজেদেরকে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। অন্ততঃ অনেক বাঙালি জাতীয়তাবাদীর এমনটিই অভিমত। আসলে চাকমা বিলুপ্তিকরণ প্রকল্প সফল হলে আখেরে অন্য কোন আদিবাসী জাতি আদৌ লাভবান হবে না। সরকারি-বেসরকারি নানা প্রচারণা ও প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে সেই চরম সত্যটি আজ আমরা যেন বুঝতে অক্ষম। কারণ রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারকদের চিন্তায় যতদিন পর্যন্ত হিন্দু ভারত, বৌদ্ধ মিয়ানমার এবং খ্রিস্টান পাশ্চাত্যের জুজুর ভয়সহ আত্মকেন্দ্রিক মুসলিম বাঙালি জাতীয়তাবাদের দর্শন কাজ করবে ততদিন পর্যন্ত কোন আদিবাসী বা সংখ্যালঘু জাতির পক্ষে আত্মপরিচয় ও মানবিক মর্যাদা নিয়ে এদেশে বসবাস সম্ভব হবে না। এযাবৎ আদিবাসীদের উপর আক্রমণ বা ধর্ষণের যত ঘটনা ঘটেছে তার শিকার শুধু চাকমারাই হননি; মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, গারোসহ প্রায় সব আদিবাসী জনগোষ্ঠীই এই তালিকায় রয়েছেন। অবশ্য বিশ্বের ক্রমপরিবর্তনশীল ভূ-রাজনীতি এবং ভারত, চীন, পাকিস্তান, ইরান, মিয়ানমার, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের প্রভাবে এই ভূখণ্ডের রাজনীতিতে আদিবাসীদের পক্ষে নাটকীয় কোন পরিবর্তন ঘটলে সেটি ভিন্ন কথা।

বাংলাদেশের নাগরিক মানেই কি বাঙালি?

আন্তর্জাতিক কূটনীতির পরিমণ্ডলে আদিবাসী ইস্যুতে জ্ঞাত কারণে বাংলাদেশ আজ এক

হাস্যকর ভূমিকা পালন করছে। সারা পৃথিবী একদিকে হাঁটলেও বাংলাদেশ হাঁটছে ঠিক তার উল্টোদিকে। সারা পৃথিবী বলছে, ঐতিহাসিকভাবে যারা বিপন্ন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তারাই আদিবাসী; দেশভেদে 'আদিবাসী' শব্দটি যে অর্থই বহন করুক না কেন। বাংলাদেশ বলছে বিপন্ন, প্রান্তিক না হয়ে শাসক জাতি হওয়া সত্ত্বেও বাঙালিরাই বাংলাদেশের 'আদিবাসী' (Indigenous People)। কারণ আদিবাসী বলতে বাংলায় 'আদি বাসিন্দা' বোঝায়। সুতরাং বাঙালি নিজেদের ডিকশনারি বহির্ভূত ভিন্ন কোন অর্থ মেনে 'আদি বাসিন্দা' হওয়ার দাবি ছাড়তে নারাজ। 'আদি বাসিন্দা' প্রমাণের জন্য নানা বিকৃত ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজ হাজিরের মরিয়া প্রচেষ্টাও চলছে। সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত উয়ারী বটেশ্বরের প্রত্ন নিদর্শন প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। কি হাস্যকর গোঁয়ার্তুমি! আন্তর্জাতিক যত সনদ, নীতিমালা ও আইন এখানে বাঙাল গোঁয়ার্তুমির কাছে পরাজিত এবং লজ্জায় অবগুণ্ঠিত।

প্রকৃত অর্থে, বাংলাদেশে নাগরিকত্ব ও জাতীয়তা প্রশ্নে মূল সমস্যাটি হলো হৃদয়ের সংকোচন-প্রসারণের, অন্তরের অনুদারতার, জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা বা কুপমণ্ডুকতার। অন্যভাবে বললে, দেশের ভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর মানুষকে, তাদের জাতিগত ও সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্যকে সমান মানবিক মর্যাদায় গ্রহণ করতে না পারার অক্ষমতার। যেমন ধরা যাক, পৃথিবীর বহু দেশে অভিবাসী হিসেবে বাঙালিরা অবস্থান করছেন। সেখানে নাগরিক হিসেবে তাদের ব্রিটিশ, আমেরিকান, ফরাসী, জার্মান, ক্যানাডিয়ান ইত্যাদি পরিচয় আছে; কিন্তু তাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় একটিই। সেটি হলো 'বাঙালি'। সেদেশের কেউ তাদেরকে নিশ্চয়ই বলে না তোমার 'বাঙালি' পরিচয় ভুলে গিয়ে এখন তুমি ফ্রেঞ্চ, ইংলিশ, জার্মান, ইহুদি ইত্যাদি পরিচয়ে বিলীন হয়ে যাও। নাহলে যেখান থেকে এসেছ সেখানেই চলে যেতে হবে, এদেশে তুমি থাকতে পারবে না। অথবা ক্রমাগত আগ্রাসনের মাধ্যমে তোমাকে নিঃশেষ করে দেওয়া হবে। তাহলে প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশে কেন তার উল্টোটি ঘটে? কেন এদেশে বসবাস করতে হলে ভিন্ন জাতিসত্তার মানুষকে বাঙালি পরিচয়ে আত্মীকৃত হওয়ার আশংকায় উদ্বিগ্ন থাকতে হয়? চাইনিজ, মঙ্গোলদের রক্ত বাঙালির শরীরে একসময় মিশেছিল বলে একজন চাইনিজকে বা অনুরূপ চেহারার চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা জাতির মানুষকে 'বাঙালি' হয়ে যেতে হবে, শুধুমাত্র এদেশে বসবাসের কারণে? একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। সেটি হলো, একই বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বা মুসলিম বাঙালির কেউ চাকমা বা অন্যান্য সংখ্যালঘুদেরকে বাঙালি হয়ে যেতে বলছেন না। বরং ভারতের সংবিধান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গেও চাকমা এবং অন্যান্যরা স্বতন্ত্র জাতিসত্তা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ নাগরিক সমানাধিকার ভোগ করছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো সেনাশাসনের ভয়াবহতা সেখানে একটি কল্পনাতীত ব্যাপার।

আসলে বহুজাতি, বহুসংস্কৃতির সন্মিলিত বৈচিত্র্যকে অন্তরে ধারণ ও শ্রদ্ধা করতে না পারার কারণে 'ভিন্ন' জাতিগত পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যের মানুষকে 'অপর' মনে হয় এবং তাকে মূলধারার সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন বলে গণ্য করা হয়। অথচ দেখা হয় না যে, দোষটা ভিন্ন

জাতির মানুষটির নয়, তাকে নিয়ে যারা 'ভিন্নভাবে' ভাবছে তাদের। সেক্যুলার শিক্ষা, প্রকৃত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, নানা জাতি-সংস্কৃতির বহুমাত্রিকতার সৌন্দর্যকে অনুধাবনের জন্য উদার গণতান্ত্রিক মানস ও উচ্চমার্গীয় সাংস্কৃতিক চেতনা সংখ্যাগুরু জনগণের মাঝে বিকশিত না হলে বাংলাদেশে এই সমস্যার সমাধান সহজে হবে না। বলাবাহুল্য, এই অসাধ্য সাধনের জন্য বৃহৎ নৃ-গোষ্ঠীর আলোকিত জনসমাজ, সেক্যুলার শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও তরুণ প্রজন্ম এবং সংস্কৃতিকর্মীদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে।

শেষ কথা

বাংলাদেশে আদিবাসীরা নিজ নিজ জাতিগত ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারবেন কিনা সে প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর পেতে হলে প্রয়োজন হবে একটি অভাবিতপূর্ব সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এবং বাঙালির মানস কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের। আগেই বলেছি, সেটি সম্ভব শুধুমাত্র একটি আধুনিক, সেক্যুলার ও গণতান্ত্রিক শিক্ষায় আলোকিত জনসমাজের মাধ্যমে, যেখানে শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতি কর্মীরা মূল ভূমিকা পালন করবেন। তারা বিবেকায়িত আপসহীন আন্দোলনের মাধ্যমে আদিবাসীসহ দেশের সকল মানুষের সমমর্যাদা ও সমানাধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রযন্ত্রকে বাধ্য করবেন। শুধুমাত্র ইস্যুভিত্তিক আবেদন নিবেদন বা সভা সেমিনারের মধ্যে নিজেদের সদিচ্ছাকে সীমায়িত রাখবেন না। কার্যকর গণসংগঠন ও সাংস্কৃতিক গণআন্দোলন গড়ে তুলবেন। গণমুখী বিপ্লবী সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করবেন এবং সার্বিক সহযোগিতা দেবেন। মনে রাখতে হবে, চাকমা-রা এবং দেশের অন্যান্য আদিবাসীরা বাংলাদেশ থেকে, দেশের সংবিধান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চান না। তাদের একমাত্র কাম্য বাঙালি জাতির পাশাপাশি নিজেদের জাতিগত এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যও সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত হোক। স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে রাষ্ট্রের কাছে তাদের চাওয়া হলো সমমর্যাদা, বৈষম্যহীনতা ও সমানাধিকার। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বহু জাতি, বহু সংস্কৃতি, বহু ভাষার বৈচিত্র্যপূর্ণ ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। কাউকে বঞ্চনা নয়, বরং যারা এখনও সংবিধানের বাইরে রয়ে গেছেন তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংহতি জোরদার করতে হবে। এক্ষেত্রে এক্সক্লুশান নয়, ইনক্লুশানই হবে রাষ্ট্রের নীতি। তবে অবশ্যই আদিবাসীদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও সমমর্যাদাকে অক্ষুন্ন রেখে। মানুষের জন্যই তো সংবিধান, সংবিধানের জন্য মানুষ নয়। সুতরাং বঞ্চিতদের কল্যাণের জন্য অবশ্যই আরেকবার সংবিধানটি সংশোধন করতে হবে। ঐতিহাসিক এই বঞ্চনার অবসান ঘটানো কি এতোই কঠিন, যেখানে জাতিসংঘের বিভিন্ন ফোরামে বাংলাদেশ অন্যান্য দেশের জাতিগত সমস্যাগুলোর সমাধানে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে?

ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশ শাসনাধীনে ছিল তখন সরকারি প্রতিনিধিদেরকে মাঝে মাঝে নিজ অঞ্চলের 'প্রজা'সাধারণের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে অবহিত করতে হতো। ভারতের তৎকালীন ব্রিটিশ প্রতিনিধি রবার্ট ক্লাইভও ১৭৭২ সালের ৩ মার্চ ইংল্যাণ্ডের হাউজ অব কমন্স-এ

গিয়ে একটি বিবৃতি দেন যেখানে বাঙালি জাতি সম্পর্কে কিছু তীর্যক মন্তব্য ছিল, যার মধ্য দিয়ে বাঙালি চরিত্রের অনুদারতা ও নীচতা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছিলেন, "ভারতবর্ষের সরকার বরাবরই একটি চরম স্বৈরাচারী সরকার। এখানকার অধিবাসীরা, বিশেষত বাংলার মানুষেরা অধস্তন অবস্থায় ক্রীতদাসসুলভ, স্বার্থপর, আজ্ঞাবহ ও বিনয়ীর মতো আচরণ করে থাকে। কিন্তু উচ্চস্তরে আসীন হলে তারা হয়ে ওঠে অত্যন্ত আরামপ্রিয়, নারী-লোলুপ, জুলুমবাজ, প্রতারক, অর্থলোভী এবং নিষ্ঠুর।" অনুরূপভাবে শিখ সম্প্রদায়ের ব্যাপারেও ব্রিটিশদের কিছু নেতিবাচক পর্যবেক্ষণ ছিল যার কারণে এখনও ভারতের সাথে ব্রিটিশ সরকারের টানাপড়েন চলছে। রবার্ট ক্লাইভের বঙ্গ বিদ্বেষী সেই সব বিশেষণ পেশ করা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় আড়াইশ' বছর আগে। এখন প্রশ্ন হলো, এতো দীর্ঘকাল ধরে বাঙালি কি আজও তার সেই হীন মানসিকতা এবং লোভী, নিষ্ঠুর চরিত্র ধরে রেখেছে? আধুনিক শিক্ষার আলোকোজ্জ্বল উদারতা ও মানবিক সংবেদনশীলতা কি এতোদিনে তার হৃদয়কে একটুও প্রসারিত করেনি? দেশের আদিবাসীদের বঞ্চনা বা অধিকারহীনতা কি বাঙালি মন ও মননের সেই অনুদারতারই প্রতিচ্ছবি? এমন সরলীকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সত্যিই কঠিন। যেখানে হাজার বছরের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, অসাম্প্রদায়িক সহজিয়া জীবন দর্শন, পীর-দরবেশ থেকে শুরু করে লালন-রবীন্দ্র-নজরুল-জীবনানন্দের মনন ও সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ সাহিত্য ও মানবিকতার মুক্ত আকাশ রয়েছে। সঙ্গত কারণে প্রশ্নটা এখানেই। কেন বাঙালি আজও অন্যের অধিকার হরণ করে? কিংবা অন্যকে তার প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার কথা উঠলে নিজেরটা হারানোর অমূলক আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন, ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে? কেন সবকিছুকে সে নিজের ভোগদখলে রাখতে চায়, যেখানে তার নিজেরও শোষণমুক্তির সংগ্রামের বহু গৌরবজনক ঐতিহ্য আছে?

মানবিকতা, সমতা, ন্যায্যতার পক্ষে মানুষের সৃজনশীল ও কল্যাণকামী চিন্তাধারা অধিকতর সমতার স্বপ্নে দিন দিন বিকশিত হচ্ছে। এখন সমাজতত্ত্ব, দর্শন, নৃ-বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানকাণ্ডের প্রচলিত ডিসকোর্সে এযাবৎ স্বীকৃত বিভিন্ন মানবধারার স্বতন্ত্র অস্তিত্বকেও মানুষ আর মেনে নিতে চাইছে না। তারা বলছে, পৃথিবীতে একটিই মানবধারা এবং সেটি হচ্ছে 'মানুষ'। অন্য সব বিভাজন কৃত্রিম এবং কিছু মানুষের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিজাত। জগতের সকল মানুষ এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জাতি ও সংস্কৃতি সমানে সমান। কেউ কারও চেয়ে বড় বা ছোট নয়। শুধু সম্পদের ক্ষেত্রে সমতা নয়, মানুষের চিন্তায়, মননেও অন্য যে কোন মানুষের প্রতি সমতার, সমমর্যাদার বোধকে জাগ্রত ও লালন করতে হবে। মানুষের মর্যাদা ও স্বীকৃতির প্রশ্নে উন্নত সমাজে এই যখন চিন্তাধারা বা স্বপ্ন, সেখানে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে আমরা বাংলাদেশে আজও কোন অন্ধকার যুগে বিচরণ করছি? কবে এদেশে সেই মহিমান্বিত সাংস্কৃতিক নবজাগরণ সম্ভব হবে যার উজ্জ্বল আলোকধারায় এই ব-দ্বীপের সব মানুষের তথাকথিত সঙ্কুচিত হৃদয় আবারও প্রসারিত ও আলোকিত হয়ে উঠবে? কবে তারা সকলে মিলে অকৃত্রিম ভালোবাসা ও সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেবে এদেশের সকল মানুষের স্বমর্যাদা, সমানাধিকার নিশ্চিত করার প্রত্যয়ে? আমরা বাংলাদেশের আদিবাসীরা আগামীর কোন সোনালী প্রভাতে বাঙালি মানসের সেই আলোকিত উদ্বোধনের প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছি।

হোচ্পানার কর্ণফুলী গেল মুরি (কর্ণফুলীর মৃত্যু)

অজল দেওয়ান

নামটা একটু খটমটে। হয়তো আরো সুন্দরভাবে নিবন্ধটির নাম দেয়া যেত। না দেখা চেঙের (নদীর) বিষয়বস্তুকে নামকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করাটা একটু দৃষ্টিকটুও বটে। তার উপর নামকরণ বিষয়টিকে বর্তমানে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন বাংলা সাহিত্যের বড় বড় দিকপালগণ। নিবন্ধটির নামকরণটিতে নিজস্ব ভাষার একটা ছাপ রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি। মাতৃভাষার নিজস্ব ঢংয়ে উচ্চারিত শব্দ যেকোন শব্দের চেয়ে অনেক সু-মধুর যেমনটা দেখতে পাই ভালোবাসার কথা '*মুই তরে হোচ্পাঙ*' বলার বহিঃপ্রকাশে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথমে ইংরেজিতে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসের কথা আমরা সবাই জানি এবং পরবর্তীতে নিজের শিকড়ের কাছে ফিরে আসার তাড়নাও আমাদের অজানা কিছু নয়। নিজস্ব মাতৃভাষার শিকড়কে অস্বীকার কেউ করতে পারে না। ভাষা ক্রমাগত পরিবর্তনশীল, যে পরিবর্তনের ফাঁদে পড়ে প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে ভাষাগুলো। তবুও পরিবর্তনকে মেনে নিয়ে সময়ের সাথে, যুগের সাথে নিজেদের ক্রমাগত খাপ খাইয়ে, শিকড়কে যতটুকু সম্ভব নিজেদের মাঝে পোক্ত রেখে মাতৃভাষার চর্চা করে যাওয়াটাই এক ধরনের প্রেম, ভালোবাসা যে প্রেম-ভালোবাসার মোহ নিজেদের মাঝেই সর্বদা বিরাজমান। মাতৃভাষা চর্চার মাধ্যমে শিক্ষা আজ সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষুদ্র জাতিসমূহ আজ চাইছে নিজেদের মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার, যে পথ আগেই রচনা করে রেখেছিল বাঙালি জাতি। আমিও এর ব্যতিক্রম নই, তাই নামকরণের ক্ষেত্রে বেছে নিয়েছি এই পন্থা। আবার বিষয়বস্তুকে নিয়ে কিছুটা আবেগের প্রশয়ও রয়েছে। আবেগকে এড়িয়ে যাওয়ার শক্তি হয়তো আছে কিন্তু ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতাকে অগ্রাহ্য করার মতো শক্তি কোথায়? তাই নাম দিয়েছি হোচ্পানার চেঙে। কর্ণফুলীর নদীর নামের উৎস সম্পর্কে আমাদের কাছে অজানা থাকার কথা নয়। কাজী নজরুলের কবিতায়ও আমরা তা খুঁজে পাই, "*ওগো ও কর্ণফুলী, তোমার সলিলে পড়েছিল কবে কার কানফুল খুলি*"। আরাকান রাজপুত্র-রাজকন্যার অপূরিত ভালবাসাকে বুকে ধারণ করা কর্ণফুলী তার ভালবাসা দিয়ে বাংলাদেশের একটা ক্ষুদ্র অংশ পার্বত্য চট্টগ্রামকে হৃদয় দিয়ে জড়িয়ে রেখেছিল। কয়েকদিন আগে স্নেহ কুমার চাকমার লেখা আত্মজীবনী

'জীবনালেখ্য' পড়লাম। তিনি কর্ণফুলীর পাড়ে চাকমা রাজবাড়ীর বর্ণনা দিয়েছেন, দিয়েছেন তখনকার রাঙ্গামাটি শহরের বর্ণনা। অনেকটা স্মৃতিকাতর করে দেয়ার মতোই, তাই আমরা তাকে ধরে রেখেছি আমাদের গানের মাঝে, একটু উদাহরণ দিই-

হেল্লে আদিক্কে স্ববনত দিক্কোং পুরান রাঙামাত্যে
তুত্যা বুয়ের বার, সিমে তুলা উড়ি যায়,
স্ববনত দিক্কোং বড় গাঙ পাড়....।।

গানের লাইনগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা ফিরে যাই আমাদের অতীতের দিনগুলিতে। ব্রিটিশ শাসনের সময় কার্পাস মহল হিসেবে পরিচিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বা চেঙে, মিইনী, কাজলং- এই ত্রিমোহনীর মিলিত স্রোত বড়গাঙ। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে পাহাড়িরা বিদ্রোহ করেছিল ১৭৭৬ সালে এবং ১৮০০ সাল পর্যন্ত যুদ্ধ করে তারা পরাজিত হয়। এরপর খাজনা হিসেবে তাদের দিতে হত কার্পাস অর্থাৎ তুলা। তাই গানের লাইনে আমাদের চোখে ভেসে ওঠে অতীতের সংগ্রামী স্মৃতি, মাথা নত না করার প্রবণতা, অন্যায়কে প্রতিরোধ করার শক্তি। চেঙে, মিইনী আর কাজলং এর ত্রিমোহনীর মিলিত স্থান আজ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাই, স্বপ্নের আশ্রয়ে খুঁজে ফিরি নিজেদের আদিম বসতিস্থল। ক্ষোভে, দুঃখে বজ্রমুষ্ঠি উঁচিয়ে বলি, *ইনকিলাব জিন্দাবাদ*। আবার যখন হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গানে সুরের মাঝে জেগে ওঠে *"হুররর টাং টাং ধনুকে রে দেরে টান"* এবং এর সুরে খুঁজে পাই সাওঁতাল বিদ্রোহের নায়ক সিধু, কানুদের তখন ইতিহাসের পাতায় ভেসে ওঠে মহাবিদ্রোহের সূত্রপাতের নায়ক মঙ্গল পাণ্ডে যিনি এবং সারা ভারতবর্ষের সিপাহীরা উজ্জীবিত হয়েছিলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। তাঁদের স্বাধীনতার স্বপ্ন যাদের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সেই সিধু, কানুদের উত্তরসূরী আজ আমরা বাংলাদেশের ৪৫টি আদিবাসী গোষ্ঠীসহ সমগ্র দুনিয়ার নির্যাযিত মানুষ।

প্রসঙ্গঃ কর্ণফুলী বা কানসা থিওং

আসামের লুসাই পাহাড়ে জন্ম নিয়ে ২৭০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে কর্ণফুলী নদী বা কানসা থিওং। চারদিক পাহাড়বেষ্টিত রাঙ্গামাটির বুক চিরে সে চলে গিয়েছে সমতলের দিকে। বাংলাদেশের প্রতিটি নদীকে ঘিরে তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষের আবেগের বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই গানে-সাহিত্যে। এ নদীর মাঝে মিশে আছে সমাজের নিম্নশ্রেণী যেমন কৃষক, জেলে, মাঝিদের জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলো। নিজের ভূমির প্রতি, নিজের দেশের প্রতি মমত্ববোধের ছায়া কোন অংশেই কম নয় এই ক্ষুদ্র জাতির মানুষগুলোর মাঝে। তবুও অতীতের স্মৃতির বাতাস যখন তুত্যা বুয়ের হয়ে আসে তখন মনে হয় বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বের আদিবাসীরা নিজেদের উজাড় করে দিয়েছে দেশের জন্য, মাতৃকার জন্য কিন্তু বিনিময়ে তাদের জন্য তা বয়ে এনেছে শোষণ, বঞ্চনা আর হারানোর কষ্ট। যেমন, কর্ণফুলীর প্রসঙ্গেই আসা যাক যেহেতু লেখাটা

তাকে নিয়েই আবর্তিত। দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর একটি অংশে লক্ষাধিক মানুষের বাস এবং কর্ণফুলীকে কেন্দ্র করে তারা তাদের জীবনের সমস্ত কিছুকে মিশিয়ে দিয়েছে। কবিতায়, উভোগীতে উঠে আসে নদীর সাথে মানুষের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ঢেউ। *''....১৯৬১ সালের কাপ্তাই বাঁধ চালু না হওয়া পর্যন্ত এ নদীই ছিল যাতায়াত ও পণ্য পরিবহনের প্রধান উৎস। রাঙ্গামাটি ও চট্টগ্রামের যাতায়াতের প্রধান বাহন ছিল লঞ্চ এবঙ বাণিজ্য চলত ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকার মাধ্যমে। এই নৌকাগুলি ছিল নদীর প্রধান আকর্ষণ। উজানে যাওয়ার সময় মাঝিদের খুবই কষ্ট হত কারণ অনেক সময় গুন টেনে স্রোতের বিরুদ্ধে নৌকা চালাতে হত। স্রোতের টানে নৌকা চালানো অনেক সহজ। তখন মাঝিরা আনন্দে গান করত। বিহ্বল হয়ে সে গান শুনতাম.....''; ''কর্ণফুলীতে প্রচুর মাছ ছিল। রুই, কাতলা, আইর, বেলে মাছ ও চিংড়ি অধিক পরিমাণে পাওয়া যেত। বাল্যাগুড়াসহ অন্যান্য ছোট মাছ অত্যন্ত সুস্বাদু ছিল। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে সমুদ্র থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ উজানে আসত। আমরা স্রোতের টানে নৌকা ভাসিয়ে জাল দিয়ে ইলিশ ধরতাম। এখন এগুলো শুধু স্মৃতি।'' (আমি ও আমার পৃথিবীঃ ড. মানিক লাল দেওয়ান, পৃষ্ঠা নং- ২১)*

এছাড়াও, আরো বিভিন্ন মানুষের আত্মজীবনীতে উঠে এসেছে কর্ণফুলীর সৌন্দর্য। মানিক লাল দেওয়ানের একটা ঘটনার বর্ণনা না দিয়ে পারছি না, তিনি লিখেছেন, কর্ণফুলী নদীর উপর লঞ্চ দিয়ে যাওয়ার সময় বন্য হাতির পাল যখন নদীতে নেমে লঞ্চের রাস্তা বন্ধ করে দিতো তখন বড় বড় ঢোল পিটিয়ে তাদের তাড়ানো হত এবং এ এক অভাবনীয় দৃশ্য। এ দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য আমাদের কোন দিনই হবে না আর। সৌভাগ্য হবে না পুরোনো রাঙ্গামাটি শহরে ঘুরতে যাওয়ার, যেখানে শুয়ে রয়েছে আমাদের পূর্বসূরীদের জীবনের সুখের মৃতদেহ।

এরপর কর্ণফুলীকে নিয়ে আরো কিছু লেখার চেষ্টায় ছিলাম। কিন্তু, আমাদের নদীর ইতিহাসকেই পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। উইকিপিডিয়া থেকে শুরু করে এনসাইক্লোপিডিয়া সবগুলোতেই মুখ্য হয়ে আসে কর্ণফুলীর উপর নির্মিত বাঁধ। এভাবে ধীরে ধীরে নদীর সৌন্দর্যকে শুধুমাত্র আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে কিছু অঞ্চল জুড়ে। চট্টগ্রাম বন্দর নির্মিত হওয়ার পরপরই নদীটি গুরুত্বপূর্ণ নদী হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং সেখানে তাকে স্বাভাবিক গতিতে চলতে দেয়া হলেও তার প্রকৃত রূপ আমরা খুঁজে পাইনি যারা এতদিন ধরে কল্পনায় দেখে এসেছি বড়গাঙ, দেখে এসেছি কর্ণফুলীর পাড়, দেখে এসেছি শান্ত-সৌম্য নদীর উপর নৌকার চলার দৃশ্য।

কাপ্তাই বাঁধ নাকি কাপ্তাই হ্রদ?

প্রশ্নটা চলে আসে যখন আমরা দেখতে পাই কাপ্তাই নামক স্থানে বাঁধ দেয়ার ফলে বাঁধের নামই হয়ে যায় কাপ্তাই বাঁধ আর এর ফলে সৃষ্ট হ্রদের নাম হয়ে পড়ে কাপ্তাই হ্রদ। সেখানে কর্ণফুলীর নাম-

গন্ধও খুঁজে পাওয়া যায় না। কর্ণফুলীর মৃত্যুকে এভাবে ত্বরান্বিত করা হয়েছে। ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে কর্ণফুলীর ভালবাসার কথা। কর্ণফুলীর নামের সাথে সাথে পানিতে তলিয়ে যাওয়া বড়াদাম, মগবান, বালুখালী, বুড়িঘাট মৌজাগুলোর নাম আজ বিস্মৃত অধ্যায়। *"যে কর্ণফুলীকে কবিরা চঞ্চলা ষোড়শীর সাথে তুলনা করেছিল আমি এ সবের স্মরণে রেখে কাপ্তাই হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্টের নাম পরিবর্তন করে কর্ণফুলী হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্ট নামকরণ করার যৌক্তিক দিক তোলার প্রয়াস পেলাম। যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানতে পারে এখানে কর্ণফুলী নামে একটি বড় নদী ছিল। যেটা এখন অনেক সন্তানেরা বিশ্বাস করতে চায় না যে-এখানে একটি নদী ছিল। অন্ততঃ কর্ণফুলী নদী নামটি যেন আমরা সকলে মনে রাখি" (জীবনালেখ্যঃ স্নেহ কুমার চাকমা, পৃষ্ঠা নং-২৪)।*

গতবছর ঘুরতে রাঙ্গামাটি গিয়েছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বন্ধুর বাড়ি রিজার্ভ বাজারের কাছে। তাকে নিয়ে ঘুরতে গেলাম শহীদ মিনারের দিকে। শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে কিছুটা নিচের দিকে হেঁটে যাওয়ার রাস্তা আছে যেখানে মাটি ভরাটের মাধ্যমে হ্রদের পাড় ভাঙনকে রোধ করা হয়েছে, সেখানে গিয়ে দুইজনে আড্ডা দিতে বসলাম। সামনেই তখন বিশাল হ্রদ আর দূরে পাহাড়ের গায়ে সাদা মেঘের স্তূপ। অপরূপ এই সৌন্দর্য যা মানুষকে মুগ্ধ করার মতোই কিন্তু এই সৌন্দর্য আমাদের কাছে কতটা উপভোগ্য? জীবন যেখানে কঠিন সেখানে রূপের মূল্যায়ন সামান্যই। তাইতো, আমরা সুকান্তের কবিতায় ক্ষুধার রাজ্যে পূর্ণিমার চাঁদকে আবিষ্কার করি ঝলসানো রুটিরূপে।

৫৪ হাজার একরের বিশাল এক জায়গা জুড়ে রয়েছে বর্তমান এই হ্রদ। জীবনধারণের উৎস হিসেবে হাজারো মানুষের চোখের মণির চলমান যাত্রাকে রুদ্ধ করে দেয়ার প্রশ্ন এখানে চলে আসে। নদীর বুকে বাঁধ দেয়ার মানেই তার স্বাভাবিক গতিপ্রবাহকে নষ্ট করে দিয়ে তিলে তিলে তার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করা। কর্ণফুলীকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়ে বিদ্যুৎ নামক সভ্যতার আবিষ্কারকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার নামে অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি প্রযুক্তি এসে লক্ষমানুষকে বাস্তুহারা করল। প্রতিবাদের আগুন তখন ছাইছাপা হয়ে পড়েছিল সবার মাঝে, উচ্চবংশীয় জমিদারদের নীরবতাও যেন ব্যঙ্গ করছিল তাদের। কিন্তু, যে আগুনের ঝাপটা এসে আঘাত করার কথা তা নিভেই রইল লক্ষ মানুষের চোখের জলে। সে জলে ধীরে ধীরে ভরে উঠল আজকের কাপ্তাই হ্রদ। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে পর্যটকরা এখানে ঘুরতে আসেন, পাহাড় ও হ্রদের সম্বিলিত সৌন্দর্য অবলোকন করেন, পাহাড়ি মানুষদের দৈনন্দিন জীবনের কঠোর সংগ্রাম দেখে মুগ্ধ হন, ঐহিত্যবাহী পোশাক গায়ে জড়িয়ে নাচে-গানে সুর-তাল মেলান। কিন্তু তাদের কাছে অনেকটাই জানা থাকে না নাচে-গানে আমরা জড়িয়ে রেখেছি আমাদের পুরোনো রাঙ্গামাটিকে, জড়িয়ে রেখেছি আমাদের কষ্টের তীব্রতাকে, জড়িয়ে রেখেছি আমাদের চোখের জলে ভরে ওঠা কাপ্তাই হ্রদকে যাকে আমরা নাম দিয়েছি "অশ্রুর হ্রদ"।

একটু ভিন্ন প্রসঙ্গ : টিপাইমুখ বাঁধ

এখানে যেহেতু কর্ণফুলী প্রসঙ্গের সাথে সাথে তার নিকটবর্তীর মানুষগুলোর কষ্টের কথা উঠে এসেছে তাহলে আরেকটি ভিন্ন আলোচনা এখানে না করলেই নয়। বরাক নদীর

কথা আমরা জানি। এ নদীটি সিলেট অঞ্চল দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর নাম ধারণ করেছে। ব্যক্তিগতভাবে সিলেটে থাকা হয় এ কারণে দুই নদীর সৌন্দর্যকে উপভোগ করার সুযোগও হয়েছে। কয়েকবছর যাবত ভারত সরকার বরাক নদীর উৎসমুখে টিপাইমুখ নামক স্থানে বাঁধ দেয়ার যে পরিকল্পনা করে তাতে প্রায় মণিপুর রাজ্যের আদিবাসীদের উপর মানবিক বিপর্যয় নেমে আসে। পরবর্তীতে স্থানীয় জেলিয়াংগ্রং, হামার, নাগা ও কুকি আদিবাসীরা জোটবদ্ধ হয়ে এ বাঁধকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। এ বাঁধ নির্মাণ হলে ৩১১ বর্গ কিলোমিটার (৭৬ হাজার একর যা কাপ্তাই হ্রদের চেয়েও বড়) এলাকা পানিতে তলিয়ে যাবে যার ২২৯ বর্গ কিলোমিটার সংরক্ষিত বনভূমি, আবাদী জমি ও আবাসন এলাকা। টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ হলে প্রায় ৪০-৫০ হাজার আদিবাসী তাদের ভিটেমাটি হারা হবেন।

দুইটি বিষয় কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। কতটুকু সেটা হৃদয় দিয়ে অনুধাবণের ক্ষেত্রটিকে অনুসরণ করাটাই সমীচীন। কারণ, আজকের ২০১৪ সাল আর ১৯৬০ সালের প্রেক্ষাপটকে কিছুটা মিলানোর প্রচেষ্টা হয়তো নিজের ভেতরে সৃষ্টি হওয়ার প্রয়াস পাচ্ছে। দুই সময়কে একসূত্রে বাঁধার পরিস্থিতি কিছুটা সময়সাপেক্ষ, তবুও হারানোর হাহাকারের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। যারা সেখানকার ভিটেমাটি, প্রকৃতি, পরিবেশের সাথে মিলিয়ে নিজেদের আবেগ-অনুভূতিকে ভাগাভাগি করার মাধ্যমে তাদের সুখের জীবনের স্বপ্নকে লালন করে আসছিল, তাদের স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে জীবনের শিকড়কে উপড়ে ফেলার মাধ্যমে হয়তো আরেকবার মানবিক বিপর্যয় ঘটবে যা আমরা '৬০ সালে দেখেছি। দুই অঞ্চলের প্রেক্ষাপট আজ আমাদের কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে সমপর্যায়ের। রাষ্ট্রীয় শোষণের যন্ত্র কোন সীমানা মানে না, কোন বাধা মানে না তাই দুই দেশের দুই ক্ষুদ্র অঞ্চলের মানুষের উপর রাষ্ট্রীয় শোষণের চরিত্রও সমপর্যায়ের।

ক্যামেরার চোখে কর্ণফুলী : নিঃশব্দ কান্নার আলোড়ন

তখন ২০০৩-০৪ সালের কথা। হাইস্কুলে পড়তাম এবং ছোটকাল থেকেই রাজনৈতিক পরিবেশে বড় হওয়ার কারণে নিজের মাঝেও রাজনীতিকে অনুভব করতাম। বড় ভাই-বোনরা একটা সাদা মলাটের সিডি নিয়ে কম্পিউটারে এসে দেখতো এবং তা নিয়ে তুমুল বিতর্ক জুড়ে দিতো। মাঝে মাঝে মুরুব্বীরাও এসে আলোচনায় বসতেন। ছোট ছিলাম বিধায় আমাকে আলোচনায় নেয়া হত না। তবে, বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে কর্ণফুলী নদীর কান্নাকে বুঝে ওঠার মতো পরিবেশ পাই এবং দেখতে থাকি হোচ্পানার চেঙের অবারিত অশ্রুধারাকে। অনেকটা মনে হল আমেরিকানদের চোখে রেড ইন্ডিয়ানদের বর্ণনা বা ভিয়েতনাম যুদ্ধের বর্ণনা অথবা বলা যায় পাকিস্তানের কোন প্রগতিশীল নাগরিকের চোখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। তানভীর মোকাম্মেলের প্রামাণ্যচিত্রটির মূল্যায়ন আসতে পারে বিভিন্ন দিক থেকে তবে তা কালোত্তীর্ণ নয়। অনেক বাঙালি বন্ধু বা সুহৃদকে পেয়েছি

যারা এটি দেখে বুঝতে চেয়েছেন পাহাড়িদের কষ্ট, বুঝতে চেয়েছেন পাহাড়ের রাজনৈতিক অবস্থা। কিন্তু তাদের কাছে প্রামাণ্যচিত্রটির আবেদন যতটুকু আমাদের কাছে ততোটা নয়। সহানুভূতি বা আবেগের সঞ্চারণের চেয়ে বাস্তবতাকে নিরীক্ষা করলে আদিবাসীদের কান্নাকে সঠিকভাবে প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে হয়তো আমাদের মাঝে তার আবেদনকে সম্প্রসারিত করা যেত কিন্তু নির্মাতার একপেশে ভূমিকার (এখানে আমি একপেশেই বলব) কারণে তা আমাদের কাছে কিছুটা আবেদন হারিয়েছে। প্রামাণ্যচিত্রটির মাঝে অনেক ধরনের গলদ রয়েছে তা আরো বিশদভাবে আলোচনা করার বিষয়। এই ক্ষুদ্র পরিসরে যতটুকু সম্ভব আলোচনা করবো।

পার্বত্য চট্টগ্রাম '৪৭-এর পর থেকেই অশান্ত হিসেবে বিরাজ করছিল। শুরুটা হল যখন রাঙ্গামাটিকে ভারতের সাথে আর বান্দরবানকে বার্মার সাথে যুক্ততার প্রবল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সাথে যুক্ত করে দেয়ার মাধ্যমে ১৯০০ সালের ব্রিটিশ কর্তৃক প্রণীত রেগুলেশন এ্যাক্ট হুমকির মুখে পড়ে যায়। এরপর আসামের রিফ্যুউজিদের পুনর্বাসন, ফলাফল- দাঙ্গা হয়ে দাঁড়াল নিয়তি। এরপরই বাঁধের পানি এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল জীবনের সমস্ত সুর, আবেগকে। স্বাধীনতা পরবর্তী ঘটনাবহুল ইতিহাস তো আরো করুণ, সরাসরি জাতিসত্ত্বার উপর আঘাত এসে পড়ার কারণে রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। এভাবে ধীরে ধীরে শান্তিবাহিনী গঠিত হয় এবং আদর্শিকভাবে গেরিলা এ বাহিনীটি মাওপন্থী হিসেবে বিরাজ করে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, প্রামাণ্যচিত্রে শান্তিবাহিনীর দুই প্রাক্তন সদস্যের বক্তব্যের উপস্থাপনা অনেকটাই নাটুকেপনায় পরিপূর্ণ। সুকান্তের "আঠার বছর বয়স ভয়ঙ্কর, তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা"র উপস্থাপন যেন আদর্শিক দিক অনেকটাই গৌণ করে দিয়েছে। শান্তিবাহিনী ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের অনেক রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর সরকার শান্তিবাহিনীর সাথে পার্বত্য চুক্তি করে কিন্তু চুক্তিকে কেন্দ্র করে মানুষের যে প্রত্যাশা তার সঠিক প্রতিফলন না হওয়ার হতাশা পরিলক্ষিত হয় প্রামাণ্যচিত্রে। পার্বত্য চুক্তিকে কেন্দ্র করে চুক্তিবিরোধী সংগঠন হিসেবে ইউপিডিএফ'র সৃষ্টি, তাই প্রামাণ্যচিত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও উঠে আসতে পারত। পার্বত্য অঞ্চলে সবচেয়ে বড় সমস্যা ভূমি সমস্যা, এ অঞ্চলটি ১৯০০ সালের রেগুলেশন এ্যাক্ট দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছিল এবং গোটা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা পরিচালিত হচ্ছিল লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা। '৪৭-এর দেশভাগের বদৌলতে পার্বত্য অঞ্চল যুক্ত হয়ে পড়ে বাংলার সঙ্গে। ফলে, দুই আইনের প্রয়োগ পরবর্তীতে মূল সমস্যার সূত্রপাত করে। প্রামাণ্যচিত্রটি এই বিষয়গুলো তুলে ধরার ক্ষেত্রে দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছে। ২০০৩ সালে ১৯০০ সালের রেগুলেশন এ্যাক্ট রদ করার পর নতুন আরেকটি রেগুলেশন প্রবর্তন করা হয় কিন্তু তার কোন বক্তব্য আমরা সেখানে দেখতে পাই না। পার্বত্য এলাকায় বিশাল বনাঞ্চল যেন সেনাবাহিনীর মদদে দুর্নীতি থেকে শুরু করে সেটেলারদের ব্যবসাকে ফুঁলে-ফেঁপে করে দেয়ার উৎসবে পরিণত হয়েছে। নির্মাতা কিছুটা হলেও এদিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছেন।

সেটেলারদের ক্রমাগত ভূমিগ্রাস, সেনাবাহিনী কর্তৃক পাহাড়ি নারীর হয়রানির ঘটনাগুলো প্রামাণ্যচিত্রে ভালোভাবে স্থান পেয়েছে।

"দাদা, মরে বাঁজা" কথাটা এতই প্রচলিত যে আর বলার প্রয়োজন হয় না, জীবনের শেষ আর্তনাদটি কার। অপহরণের ১৭ বছর পরও রাষ্ট্র কল্পনা চাকমাকে খুঁজে পায়নি। কল্পনার পরিবার এখনো তাঁকে মৃত হিসেবে দাবি করতে রাজি নয়, যদি তাদের আদরের বোন, মাসিটি এসে হাসিমুখে বলে, "মুই ইচ্চোঙ দ"। নির্মাতা কল্পনা চাকমা নিয়ে কোন মন্তব্যই করেননি, এ বিষয়টি তিনি সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছেন। ফলে, গোটা প্রামাণ্যচিত্রটিই হয়ে পড়ে প্রশ্নবিদ্ধ। প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে পার্বত্য চুক্তিতে উল্লেখিত সেনাবাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের বিষয়গুলোকে গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে। আরো অনেক বিষয়কেই এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতাও লক্ষ করার মতো, যেমন কাপ্তাই বাঁধ নির্মিত হওয়ার পর লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা হওয়ার পর তাদের গন্তব্য কোথায় ছিল, তারা কি ক্ষতিপূরণ পেয়েছে কিনা এসব প্রশ্নগুলোও করা হয়নি। সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই প্রশ্নের ভিন্নতা। হয়তো এখানে নির্মাতা ইচ্ছে করেই শ্রেণীকে বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে এলিট ও নিম্ন পর্যায়ের ক্ষেত্রে তার বিবেচনাবোধ কাজ করেছে। ফলে, এলিটশ্রেণীর ভবিষ্যৎ ভাবনা আর নিম্নশ্রেণীর মানুষের বর্তমান ভাবনাকে তিনি একসূত্রে গেঁথে দিয়েছেন তাঁর কর্মে।

প্রামাণ্যচিত্রটির বিশ্লেষণ একটু একপেশে হয়ে গিয়েছে অতিমাত্রায় কাটাছেঁড়া করতে গিয়ে, ফলে ব্যক্তিগতভাবে একটু খতিয়ে দেখার প্রয়োজন অনুভব করেছি এতো কাটাছেঁড়া বিশ্লেষণের যৌক্তিকতা। আবার, পরক্ষণে অনুভব করেছি এই বিশ্লেষণ শুধু আমারই নয়, আমি এখানে হয়ে দাঁড়িয়েছি সমগ্র পাহাড়িদের প্রতিনিধিরূপে যে তাদের অতীতের হাহাকারের দৃশ্যায়ন ক্যামেরায় কতটুকু পরিপূর্ণতা পেয়েছে তা যাচাই-বাছাই করে দেখার। ফলে, প্রামাণ্যচিত্রটি সম্পর্কে আমার যে দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশ্লেষণ তা হতে সরে আসার কোন কারণ থাকতে পারে বলে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি না। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর সংস্কৃতির ভাঙা সেতু প্রবন্ধগ্রন্থে বলেছেন, আদিবাসীরা তাদের নিজেদের সাহিত্য রচনা করবে; নিজেদের সমাজের ভাঙা-গড়াকে নিজেরাই বিশ্লেষণ করবে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। ফলে, আমাদের অতীতের মানবিক দুর্যোগের ইতিহাসের উপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্রকে আমাদের চোখ দিয়েই বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

শিল্প-সাহিত্যে কর্ণফুলী

নদীর উপর দিয়ে চলছে নৌকা, জীবন ধারণের উপকরণ নিয়ে। নদীর দুপারেই সবুজ গাছপালা, হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়ে কিছু গ্রামও। গ্রামের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ধরছে মাছ, করছে খেলা। নদীর এ দৃশ্য আমাদের পুরো বাংলাদেশের গ্রামবাংলার দৃশ্য। কর্ণফুলীও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। ফলে, আমাদের বাঙালি চিত্রশিল্পীদের তুলিতে উঠে এসেছে বারবার এ দৃশ্যগুলো। কিন্তু, আমাদের পাহাড়ি

শিল্পীদের মাঝে এর অভাবটুকু আমরা লক্ষ করি। শিল্পীর তুলিতে বেশি স্থান পেয়েছে পাহাড়ি কন্যার নাচের দৃশ্য, প্রতিদিনকার জীবনের কষ্ট-প্রেরণা। হয়তো জীবনকে আমরা এর মধ্য দিয়েই খুঁজে নিয়েছিলাম, খুঁজে নিয়েছিলাম আমাদের সংস্কৃতির চিত্রায়ন, অনুভূতির ছোঁয়াকে কল্পনায় অনুভব করে এঁকে চলেছিলাম তারই জয়গান। কিন্তু তবুও আমাদের মনে-প্রাণে সমস্ত সত্তা জুড়ে রয়েছে এ কর্ণফুলী।

সাহিত্যেও কর্ণফুলীকে তেমন রূপায়িত করা হয় নি। সুবিশাল বাংলা সাহিত্যেও কর্ণফুলীকে যেন বৈমাত্রেয় করে রাখা হয়েছে। আলাউদ্দিন আল আজাদের "কর্ণফুলী" বাদে আমরা তেমন কোন কিছু দেখতে পাইনি। এছাড়া কবি ওহিদুল আলম ১৯৪৬ সালে 'কর্ণফুলী মাঝি' নামে একটি কাহিনী-কাব্য রচনা করেন। তবে, চট্টগ্রামের আঞ্চলিক পরিসরে একে নিয়ে অনেক কবিতা-গান-থিয়েটার কবিতা রচিত হয়েছে। পাহাড়ি সাহিত্যে হয়তো মঞ্চস্থ করা যেত কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। পাহাড়ি কবিতায়ও উঠে এসেছে ক্ষুব্ধতা, প্রতিবাদের ঝড়। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি কবিতা চাকমার 'জ্বলি ন উধিম হিত্যেই' কবিতাটি এর বড় উদাহরণ আমাদের সামনে। ক্রমাগত শোষণ, নিপীড়নের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে সংগ্রামই আমাদের কাছে তখন মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। তবুও কবিরা লিখেছেন তার প্রতি ভালবাসাস্বরূপ-

কর্ণফুলী
যেন তুমি আমাকে শেখাবেই শেখাবে
পাহাড় চূড়ার গোপন সঙ্গম কথন
তাড়িয়ে আনলে আমাকে চিতার ক্ষিপ্র দৌড়ে
কী সহজে হজম করলে আমার বুরগি-বালোজ
তারপর থেকে ছুটছি তো ছুটছি
খুঁজে পাচ্ছি না আমার প্রকৃত ঠিকানা

(লেখক : আলোড়ন খীসা)

এছাড়াও আরো একটি কবিতা আমরা পড়ে আসি,

কর্ণফুলী
সুন্দর ঐরে কর্ণফুলী যায়রে নেচে হেলিদুলি
ঝরঝর ঝরঝর ফর্‌ফর্ ফর্‌ফর্
পাহাড় চিড়ে বনানী 'পরে
নামছে ঐরে পাহাড়ি রমণী।
সুন্দর ঐরে কর্ণফুলী যায়রে নেচে হেলিদুলি
চল্‌চল্ ছল্‌ছল্ ঝল্‌মল্ টল্‌মল্
ছলছল করে ঝলমল জ্বলে
নামছে ঐরে লুসাই দুলালী।।

(লেখক : সুগত চাকমা)

কর্ণফুলীর প্রতি অভিমানে ভরা আর তাকে নারী-প্রেমিকা রূপে কল্পনা করে লেখা কবিতাগুলো যেন আমাদের সবার মনের অনুভূতি। ঠিকানার খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে লেখকের মতো আমরাও আজ হারিয়ে যাই সুবিশাল পৃথিবীর বুকে যেখানে বর্তমানে বিরাজ করছে হিংসার ভয়াবহ স্রোত।

চাকমা গানে কর্ণফুলী

কর্ণফুলী বললেই আমাদের চোখে ভেসে উঠে কোন পাহাড়ি মেয়ে হয়তো তার জলের স্রোতধারাকে স্পর্শ করে বলছে *"কর্ণফুলী ধুলি ধুলি, হুদু যেবে হনা, যেদুং চাঙ মুই ত সমারে, মরে নেযা না"*। এ যেন সংসারের বদ্ধ পরিবেশ থেকে দূরে চলে যাওয়ার এক আকুতি। কিন্তু বহুদূরে শিকড় গেঁথে রয়েছে, তাই তাকে থাকতে হয় তার পরিবারের সাথে, জীবন বয়ে যায় নদীর চলমান স্রোতধারা পর্যবেক্ষণে। কর্ণফুলীকে নিয়ে আমরা আর স্বপ্ন দেখতে পারি না, পারি না তাকে নিয়ে আনন্দ বা সুখের কোন গল্প-কবিতা-গান রচনা করতে। তার নাম শুনলেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে নদীতে ভেসে চলা মানুষের কষ্টের আর্তনাদ যারা শেষবিদায় নিচ্ছে তাদের জন্মভূমি থেকে। *"মনমুরো ছড়াগান ফেলে যাঙগল্লোই, সিগোন সিগোন হদাআনি ইদোত উদেরলোই"* বা *"গধাআন অবার পরেনদি, নানান মানেই নানান জাগাত যিয়োন তারা মনদুক্কানিলোই"* গানগুলো মনে করিয়ে দেয় তখনকার মানুষগুলোর সব হারানোর আর্তনাদকেই। এছাড়াও, গাওয়া হয়েছে আরো কিছু গান, যেমন :

১. *রাঙামাত্যার কর্ণফুলী*
আমা জাগা হারেয়েই পানি ডুবেই
কাপ্তেই গদা পানি আমারে লাহ্‌রেই
আগ ধক্ষ্যেন রাঙামাত্যান ইক্কে দ' আর নেই।।
২. *রাঙামাত্যার তলেদি আমা ঘরান এল*
কাপ্তেই গদা'নে আমা ঘরান ডুবেল।।
৩. *ন-থেবং একদিন এই পৃথ্বিমীত চিৎপুরে গোই*
ফেলে যেবাল্লোই এ আদামান
ন-থেবং একদিন হেউই ন-থেবং
চিৎপুরে গোই ফেলে যেবাল্লোই রাঙামাত্যায়ান।।

সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে

জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় ধানসিঁড়ি নদীর প্রতি গভীর মমতায় খুলে দিয়েছেন হৃদয়ের সমস্ত জানালা। মাইকেল মধুসূদন দত্ত আকুতি জানিয়েছিলেন কপোতাক্ষ নদের প্রতি। ঠিক তেমনি পাহাড়ি মানুষদের জীবন জুড়ে আছে কর্ণফুলী। হয়তো ফিরে আসার আকুতি নেই, হয়তো কাছে পাওয়ার আবেদন নেই তবুও তারা যেন তারই সন্তান। ফুলবিজুতে তার বুকে ডুব দিয়ে

'বিজুগুলু' খুঁজতে যাওয়া আজ হারিয়ে গিয়েছে, ছলছল শব্দের অবিরাম ধ্বনি যেন অনুপস্থিত, বাঁশ কেটে তার বুকে ভাসিয়ে দিয়ে ভাটার টানে চলে যাওয়া আর নেই। জীবনের সমস্ত কিছু হারিয়ে গিয়েছে তার মৃত্যুর সাথে সাথে। সে যেন মৃত্যুকে বরণ করেছে তার সবচেয়ে প্রিয় পুরোনো রাঙ্গামাটিকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে। শীতের সময়ে পুরোনো রাজবাড়ির চূড়া যখন হ্রদের পানিতে ভেসে উঠে তখন তার মৃত্যুকে যেন অনুভব করা যায়, হ্রদের কালো পানি ব্যঙ্গ চোখে তাকিয়ে থাকে আকাশের পানে তার মৃত্যুর ধ্বনি শুনিয়ে। বাঁধের ফলে রাঙ্গামাটি ছেড়ে চলে যাওয়া প্রতিটি মানুষের বুকে ঢেউ তোলা কর্ণফুলী আজো অমলিন তার সন্তানদের কাছে। হয়তো দূরের এক গ্রামে কোন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ঘরে কুপি জ্বালিয়ে এখনো ভাবে তার ফেলে আসা জীবনের কথা, ফেলে আসা নদীর কথা।

শেষ কথা

ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র "তিতাস একটি নদীর নাম" বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মা নদীর মাঝি" -এ দুই মহৎ সৃষ্টি আমাদের মনকে আলোড়িত করে এবং মনে করিয়ে দেয় কর্ণফুলীর মৃত্যুর কথা। কুমুরডাঙ্গার পাড়ের নদীর মরণের আর্তনাদ হয়তো আমরাও শুনতে পাবো কর্ণফুলীর বুকের মাঝে। যে মৃত্যু শুধু তার নয়, এ যেন গোটা একটি জাতির শিকড়কে সমূলে উপড়ে ফেলার এক প্রচেষ্টা। বর্ষায় উন্মত্ত বাতাসে গর্জনরত যমুনা বড়গাঙ এর স্রোতের কল্পিত রূপ হিসেবে আমাদের মনে ধরা দেয়। গঙ্গাকে যখন বলা হয় গানের মাধ্যমে 'এত সুন্দর নামটি তোমার কে দিয়েছে বলো' তখন কর্ণফুলীকেও জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে তার নামের সৌন্দর্য। এ সৌন্দর্য যেন শুধুই মুগ্ধতার, ভালবাসার, কষ্টের, হারানোর বেদনার। বিশদ লেখার শেষে একটা কবিতা দিলাম, একটি রেড ইন্ডিয়ান কবিতা :

ওই দূর পাহাড়
এতদিন কি ভুলে গিয়েছিলাম,
এখন মনে পড়ছে,
আমার বাড়ি ওইতো ওদিকে
ওইতো ওখানে,
ওই নীল পাহাড়ের কোলটি ঘেঁষে।।

এখন যখন, দূর বহুদূর থেকে
চোখ ফেরাই,
ওই পাহাড়কে দেখি,
চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে,
বাড়ি থেকে দূরে এতদূরে
যেন শিকড় কেটে গেছে আমার
আমি ভাসমান হয়ে গেছি,
আমার ঘর নেই, পথও।।

নিকোলাই চাক্‌মা'র কবিতা

অবিচী রূপ ধুরি

তিরোচ মরিদ' নয়। যেধক লো গিলি যাং লো গিলিবার তিরোচ সেধক বারে
ম জিলান কাজা লো'র বাজে ধামা ধক নিগিলি
অসুর'র পেদ গালি, আরো অসুর তোগে যায়।

রিজেব' মাদির সেম সেম গোরা বাচ্চুরির চুচ্চেঙ মাধা ধক্কে মর মন
ইয়োর গুরি নেযাঙ অসিজির বুক, যিধু পাঙ যদ রেক্ষস, যদ অজাতর দল।

কন্না আঘে এ-চ মর আগুনে ভরন দিচোগো সিমেনেত
অবিচীর নুঅ রূপ মুই, জুম্ম চাগালাত কাফের মারিবাত্তেই জনম মর
সেনে তারার লো চাং, মরে লো দুঅ, লো খেই মুই তিরোচ মারেবার চাঙ।

বাংলানুবাদ

শয়তানের বেশে

তৃষ্ণা মিঠবে না। সে যতই রক্ত পান করে যাই তৃষ্ণা মিটবে না
আমার জিহ্বা রক্তের গন্ধে ধামার মত বেরোয়
আর অসুর হত্যা করে অসুরের খুঁজে যায়।

রিজার্ভ ফরেস্টের উর্বর মাটির অঙ্কুরোদগমের মত আমার মন
ফালি ফালি করে ফেলি বুক যেখানে পাই হুমকি, সংশয় আর দখলের পায়তারা।

কে আছো এসো আগুনভরা আমার দুচোখের দৃষ্টির সীমানায়
অবিচীর বেশে আমি, জুমে ওদের হত্যার জন্য আমার জন্ম
তাইতো ওদের রক্ত চাই, রক্ত দাও আমায়, রক্তে রক্তে আমার তৃষ্ণা মিটাতে চাই।

একটি বনের কাহিনী

প্রশান্ত ত্রিপুরা

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-সুষমায় ভরপুর একটা বন।
সেখানে নানান জাতের পাখি, জন্তু, সরীসৃপ আর পোকামাকড়ের বাস। প্রকৃতির সহজ ছন্দে এগিয়ে চলতো ওখানকার জীবন।
এলো মানুষ, ঘটলো ছন্দপতন।

মানুষ চালালো নির্বিচার হত্যা। বনের স্বাভাবিক জীবন গেলো বদলে। এখন মায়াবী হরিণ শিশুগুলো প্রায়ই হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়ে ভীত-সন্ত্রস্ত উৎকর্ণ মাকে দেখে। আহত বুনো শুয়োরের হিংস্র উন্মত্ততা কাঁপিয়ে তোলে সারাটা বন।

এভাবে চললো বহুদিন।

হঠাৎ মানুষদের মধ্যে কারো কারো খেয়াল হলো, এভাবে চলতে থাকলে বনের প্রজাতিগুলো সব লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের স্বার্থেই এদের রক্ষা করা দরকার। আদেশ জারি হলো বুনো জীবজন্তু, পাখপাখালি সব কিছুর শিকার পুরোপুরি নিষেধ।

কিন্তু আর একদল ছিল যারা চাইত বুনো জীবজন্তু, পাখপাখালি সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, থাকবে শুধু মানুষ।

ধরল তারা নূতন কৌশল।

তারা অভিযোগ তুললো, বুনো শুয়োররা পাইকারী হারে তাদের ফসল নষ্ট করে, বাগান ধ্বংস করে। টিয়ে প্রভৃতি পাখির ঝাঁক, বিভিন্ন পোকা-মাকড়ও একইভাবে ক্ষতি করে তাদের। আর এইসব অভিযোগে তারা নির্দিষ্ট কতগুলো বনবাসী প্রজাতির জীবনের ছাড়পত্র পেয়ে গেলো।

বনে আবার শুরু হল নূতন হত্যাযজ্ঞ, কিন্তু পাইকারী হারে নয়। শুধু নির্দিষ্ট কতগুলো প্রজাতির উপরই আঘাতটা এলো, অন্ততঃ বনের সবাই তাই ভাবলো। যেমন দু'পেয়ে জীবগুলো শুয়োর দেখলেই গুলি করে, হরিণদের হাতের কাছে পেলেও নয়।

শুয়োরগুলো ভাবলো যাদের তারা এতদিন 'বনের সৌন্দর্য' বলে প্রশংসা করে এসেছে সেই হরিণদেরই ষড়যন্ত্রের ফল এটা। হরিণরা নিশ্চয় দু'পেয়েদের সাথে কোন গোপন চুক্তিতে

আবদ্ধ হয়েছে। তাই সন্দেহে ভরে উঠলো তাদের মন। প্রাণভয়ে তারা পালিয়ে বেড়ায় আর আপাতঃ নিরাপদ হরিণগুলোকে দেখে ঈর্ষা বোধ করে তারা। তাদের সন্দেহ ও ঈর্ষা ক্রমে ঘৃণায় রূপ নিল এবং ঘৃণা রূপ নিল প্রতিহিংসায়। শুয়োররা হয়ে গেলো হরিণদের চরম শত্রু।

এরপর শুয়োররা হয়ে উঠলো চূড়ান্তভাবে হিংস্র। একটা হরিণ দেখলেই হলো, হিংস্র উন্মত্ততায় তাকে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করবেই তারা তাদের প্রচণ্ড দাঁতাল আঘাতে। আহত শুয়োররা তো আরও বেশী হিংস্র।

অন্যসব জীবজন্তু, পাখপাখালির মধ্যেও ধীরে ধীরে একইভাবে গড়ে উঠলো সহিংস শত্রুতা, হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বনের সুদীর্ঘকালের ঐক্যের ইতিহাসে প্রথমবারের জন্য ধরলো প্রকাণ্ড ফাটল। বন আর রইল না আগের সেই বন। সর্বত্র এখন গৃহযুদ্ধের ভয়াল ভয়াবহতা বিরাজ করছে।

আসলে ষড়যন্ত্রের মূল হোতা মানুষগুলো লুকিয়ে লুকিয়ে হরিণ এবং অন্য সব নিষিদ্ধ জীব ঠিকই মেরে ফেলছিল। তারা ভীষণ খুশী হয়ে উঠলো তাদের "Divide and Ruin" কৌশলের কার্যকারিতা দেখে। প্রচণ্ড আত্মতৃপ্তিতে তারা উপভোগ করে তাদের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন; বনের সমস্ত প্রজাতির বিলোপ ঘটানোর প্রক্রিয়া তারা চালিয়ে যেতে থাকে নিজেদের অদ্বিতীয় কর্তৃত্ব স্থাপনের মহান উদ্দেশ্যে।

বুড়ো শকুন, প্রবীণ ভাল্লুক, অভিজ্ঞ হরিণ-মাতা এইসব পুরনো বন্ধুরা প্রায়ই মিলিত হয় আলোচনায় এবং প্রতিবারেই তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় প্রবল হতাশা, গভীর দুঃখের সুর। নেমে আসে বিষাদময় নীরবতা। তারা লক্ষ করে বনের এই সহিংস দলাদলির মূলে নিশ্চয়ই বহিরাগত দু'পেয়ে জীবগুলোই রয়েছে। এসব কথা তারা বোঝাতে চায় সবাইকে। তারা থামাতে চায় আত্মঘাতী সংঘর্ষ। কিন্তু কেউ কান দেয় না এই 'অথর্ব'দের কথায়। কারও মাথায় জাগে না শুভবুদ্ধি। হিংস্রতা চলতেই থাকে।

একবার বুড়ো শকুন তার অন্য বন্ধুদের জানালো একটা আশার আলো সে দেখেছে।

কি? সাগ্রহে সবাই জানতে চায়।

একটা স্বপ্ন সে দেখেছে। শুনে অন্যরা আশাহত হওয়ার বেদনা বোধ করলো যেন, হাসতে চেষ্টা করলো তারা। তবু স্বপ্নটা জানতে চাইল সবাই।

> 'অন্ধকার বনে সূর্য উঠলো। সেই সূর্য থেকে বেরিয়ে এলো এক তেজবান সিংহ। সে ঘোষণা করলো বনের বিভেদ থামানোর জন্য সে আসছে। যে দূর করবে সব শত্রুতা, আনবে শান্তি। দু'পেয়েগুলোর সমস্ত ষড়যন্ত্র সে ব্যর্থ করে বনকে দেবে আগের সেই প্রকৃত বনের রূপ। সে নাকি এমন একটা মহামূল্য বস্তু আনছে যা আগে ভাগ্যবান দু'পেয়েগুলোর কাছে ছিল। কিন্তু নিজেদের ঔদ্ধত্য ও গাফিলতির কারণে সেটা তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়।'

কি সে জিনিস?
জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেকের একটি সমন্বিত রূপ।
দু'পেয়ে জীবগুলো যার নাম দিয়েছিল 'মনুষ্যত্ব'।

শকুনের স্বপ্নের বর্ণনা শুনে তার বৃদ্ধ বন্ধুরা সবাই কষ্ট করে খুশী হওয়ার চেষ্টা করলো। জোর করে তারা বিশ্বাস করতে চাইলো সুদিন আসবে, যুদ্ধ থামবে। সত্যি, স্বপ্ন কত মধুর। বিনা শ্রমের সুখ হচ্ছে ভালো স্বপ্ন তারা ভাবলো।

দুঃখ হতাশা ও ক্ষোভে ভরপুর এই বৃদ্ধ বন্ধুরা অতঃপর আলোচনা শুরু করলো নূতন প্রসঙ্গে, 'স্বপ্ন রহস্য কি দেখিলে কি হয়!'

(আনুমানিক ১৯৮১ সালে লেখা এই গল্পটি আগে কোথাও প্রকাশিত হয় নি। বলাবাহুল্য, এটির ঘটনাপ্রবাহ ও সকল চরিত্র সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত। এগুলির সাথে অতীতের বা বর্তমানের কোন বাস্তব প্রবণতা বা চরিত্রের মিল পাওয়া গেলে তা হবে একান্তই কাকতালীয়)

সমকালীন গল্প

কিপটে ঠিকাদার ও দুই জনদরদী

অডং চাকমা

নিশ্চিতভাবে জানি, জনদরদীদের চাঁদাবাজ বললে ওরা খুব মাইন্ড করবে। ওরা নিজেদেরকে জনদরদী ও জুম্ম জনগণের অধিকারকর্মী হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। ওরা নিজেদেরকে মনে করে তারা জুম্ম জনগণের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্যে মনপ্রাণ দিয়ে আত্মনিবেদিত। কাজেই তাদেরকে চাঁদাবাজ বললে ওরা খুব মাইন্ড করতে পারে। সেজন্যে তাদেরকে বলতে হবে, ইউপিডিএফ কর্মী, জেএসএস (সন্তু)কর্মী ও জেএসএস (এমএন লারমা) কর্মী। সবাই জনদরদী।

জনদরদীর সংখ্যা বেশি বলে খরচও বেশি। তাদের জনদরদী কাজের জন্যে প্রচুর টাকা প্রয়োজন। সেই টাকা আসে কোথা থেকে? তবে এটুকু সাধারণভাবে জানা আছে, সেই টাকার বড় অংশ আসে ঠিকাদারদের পকেট থেকে।

ঠিকাদারদের মধ্যেও রকমভেদ আছে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণী। পাহাড়ি-বাঙালি। সে যেই শ্রেণীর হোক, পাহাড়ি হোক, বাঙালি হোক এবং সে যেই কাজ করুক না কেন, তাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে কাজ করলে চাঁদা দিতে হয় এবং দিতে হবে। জনদরদীদের চাঁদা না দিয়ে আরামে কাজ করতে পেরেছে এমন কোন ঠিকাদার খুঁজে পাওয়া কঠিন। কোন ঠিকাদারী কাজ করলেই চাঁদা দিতে হয়।

কেন চাঁদা দিতে হবে? এই প্রশ্ন করার সাহস বোধয় কোন ঠিকাদার এযাবত করতে পারেননি। চাঁদার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেউ তাদেরকে জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্যে পাঠায়নি। তবুও জনগণের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার নামে ওরা চাঁদা দাবী করে এবং জোর করে আদায় করে নেয়। কিন্তু ঐ টাকা ওরা কীভাবে এবং কোথায় খরচ করে? ঠিকাদার কেন সাধারণ জনগণও এখনো এই প্রশ্ন করতে সাহস করেনি। তবে এরকম সাহস দেখিয়ে চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় এক নবাগত ঠিকাদারকে "কিপটে ঠিকাদার" খেতাব পেতে হয়েছিলো।

এখন আর গৌরচন্দ্রিকা নয়। সেই নবাগত ঠিকাদারের গল্প বলি। সেই ঠিকাদারের নাম ছিলো টুগুন চাকমা। টুগুনের কিপটে ঠিকাদার উপাধি পাওয়াটা অনেকের কাছে খুব মজার, আবার কারোর কাছে বেদনারও বটে।

টুগুন মা-বাবার একমাত্র সন্তান। লেখাপড়া শেষ করে কী করবে তার কোন কূল কিনারা করতে পারছিলো না। চাকরীর বাজার মন্দা। সাধারণ ভাষায় বললে, সে ছিলো বেকার। শেষমেষ বেকার উপাধি থেকে বাঁচার জন্যে তার বন্ধু অমগদ'র হাত ধরে ঠিকাদারি ব্যবসাতে নামে। ব্যবসার জন্যে টাকা জোগাড় করে মা-বাবার কাছ থেকে আর কিছু ধার-কর্জ থেকে।

আনকোরা টুগুন জানতো না এই ব্যবসা কত কঠিন। সে জানতো না এই ব্যবসার সাথে কী কী জড়িত আছে। লাভ প্রাপ্তির আশার সাথে আছে ভাগ্য বিড়ম্বনা আর বিবেকের দংশন। লাইসেন্স করলেই কাজ পাওয়া যাবে তার কোন গ্যারান্টি নেই। এখানেও আছে নোংরা রাজনীতির নোংরা খেলা।

সে যাই হোক, অনেক চেষ্টা তদবিরের পর অবশেষে কিছু সরকারি-বেসরকারি প্রকল্পের সুবাদে টুগুন কয়েকটা কাজ পেয়েও যায়। ছোট ছোট কাজ। সেচ, ড্রেন নির্মাণ এবং স্যানিটেশন ও রিং ওয়েল স্থাপনের কাজ। টাকার অংকে তার কাজের পরিমাণ খুব বেশি নয়। তাছাড়া সে তো তৃতীয় শ্রেণীর ঠিকাদার মাত্র। পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষমতাও নেই।

****

অফিস থেকে কার্যাদেশ পাওয়ার পরপরই টুগুন ইট, লোহালক্কর, সিমেন্ট, বালু ইত্যাদি মালপত্র নিয়ে কাজের এলাকায় নিয়ে যায়। এটাই ছিলো তার প্রথম ঠিকাদারির কাজ। কাজ শুরু করার দু'একদিনের মধ্যে তার কাছে দুই আঙুলের চিঠি এসে পৌঁছলো। চিঠির ভাষাটা এরকম,

"প্রিয় সুধী, পার্টির পক্ষ থেকে সংগ্রামী শুভেচ্ছা ও বিপ্লবী অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিশেষ এই, আগামী মাসের ৫ তারিখে আমাদের সাথে গোলাবাড়ী বটতলীতে দেখা করার জন্যে অনুরোধ করা গেলো। সাক্ষাতে বিস্তারিত আলাপ হবে। সংগ্রামী শুভেচ্ছান্তে

রণ"

চিঠিটা পাওয়ার পর টুগুন তেমন একটা গুরুত্ব দেয়নি। রণবাবুর সাথে তার কী বা আলাপ হবে! চাঁদার ব্যাপারটি আঁচ করতে পারলেও টুগুন মনে করেছিলো, সাধারণ গ্রামবাসীদের নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে সে কাজ করতে যাচ্ছে। তাছাড়া তার কাজের টাকার পরিমাণ খুব বেশি নয়। কয়েক লক্ষ টাকা মাত্র। কাজেই সংগ্রামী জনদরদীরা তেমন একটা মাথা ঘামাবে না।

এক দিন যায়, দুই দিন যায়। এমনি করে সপ্তাহ পার হয়ে যায়। টুগুন দুই আঙুলের চিঠি মোতাবেক রণবাবুর সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়নি। ফলে পরপর আরো দু'টি কড়া চিঠি এলো। তারপর টুগুন গ্রামের এক উপকারভোগীর মারফত খবর পাঠালো সে তার কাজের শেষে সময় করে "রণ" বাবুর সাথে দেখা করতে যাবে। কিন্তু রণ'বাবুর মন মানেনি।

একদিন রণবাবু তার এক সাগরেদ নিয়ে টুগুনের বাসায় হাজির। রণবাবুর সাথে আগে টুগুনের কখনো দেখা হয়নি। তবে তার সাগরেদকে টুগুন বেশ অনেকবার দেখেছে। টুগুন চা আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছে রণ বাবুদের জন্যে। রণবাবু অবশ্য রাগ দেখায়নি। অত্যন্ত ভদ্রভাবে আলাপটা শুরু করেছিলো। সারসংক্ষেপ করে রণবাবু জানালো, ওরা জেএসএস কর্মী। যারা ঠিকাদারী করে তাদের কাছ থেকে ওরা পার্টির জন্যে 'সহযোগিতা' নেয়। সেহেতু টুগুনকেও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে 'সহযোগিতা', মানে চাঁদা দিতে হবে। চাঁদা না দিয়ে কোন পার পাবে না।

যেহেতু চাঁদা দিতেই হবে, সেহেতু টুগুন রণবাবুর সাথে একটা আপোস রফা করলো, তার কাজগুলো শেষ হলে তার লভ্যাংশ থেকে সে রণবাবুর পার্টিকে চাঁদা দেবে।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে গেলো। এরপর টুগুন তার কাজের হিসাব মেলাতে লাগলো, কিন্তু ব্যালেন্সশিট মেলে না। কাজ শেষে বিল উঠানোর জন্যে কত জায়গায় ঘুষ আর 'পিসি' (মানে পার্সেন্টেজ) দিতে হয় তার জানা ছিলো না। বিল ছাড়াতে সংশ্লিষ্ট অফিসের জন্যে ১০%, আর পরিদর্শনকারী ইঞ্জিনিয়ারের জন্যে ৫% ঘুষ দিতে হয়। এছাড়া পিসি দিতে হবে জেএসএস'র জন্যে ৫% আর ইউপিডিএফ'র জন্যে ৫%। অর্থাৎ ২৫% টাকা ঘুষে আর পিসিতে যায়। এর উপর আছে দ্রব্যের মুদ্রাস্ফিতির জন্যে ৫% থেকে ১০% বাড়তি খরচ। সব মিলিয়ে ফাউ খরচ যাচ্ছে ৩০%-৩৫% টাকা। তাহলে তার লাভটা কোথায়? লাভ তো দূরের কথা, মূলধনটাও উঠে আসছে না। টুগুনের মাথা খারাপ হয়ে গেলো। এ অবস্থায় টুগুন সিদ্ধান্ত নিলো জেএসএস-ইউপিডিএফ'কে 'পিসি' দেবে না। কিন্তু দেবে না বললেই কি পার পাওয়া যায়? না, পাওয়া যায় না।

দিন যায়, সপ্তাহ যায়। রণবাবুদের অপেক্ষার বাঁধ ভেঙে যায়। ফোনের পর ফোন আসতে থাকে। দুই আঙুলের চিঠি আসতে থাকে একটার পর একটা। অবশেষে টুগুন রণবাবুদের কথা দিলো সে টাকা দেবে, তবে তার বাসা থেকে নিয়ে যেতে হবে। গাছতলায়, বটতলায় কিংবা বাঁশতলায় গিয়ে সে টাকা দিয়ে আসতে পারবে না।

এদিকে রণবাবুরাও নাছোড়বান্দা। ওরা মনে করছে, টুগুন ইচ্ছা করে টাকা দিচ্ছে না। তারা যেভাবেই হোক টুগুনের কাছ থেকে তাদের প্রাপ্য (?) 'পিসি' আদায় করে নেবে।

অবশেষে রণবাবু তার সাগরেদকে নিয়ে একদিন সন্ধ্যাবেলায় টুগুনের বাসায় হাজির। রণবাবু রাগে লাল, যাকে বলে অগ্নিশর্মা। বাসার দরজায় কড়া নাড়তেই টুগুন দরজাটা খুলে দিলো। রণবাবুকে দেখে টুগুন সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলো, "নমস্কার দা।"

"নমস্কার নিতে আসিনি, টুগুনবাবু", বললো রণবাবু।
"দাদা, বসেন।"
"বসতে আসিনি। সোজা আঙুলে ঘি উঠে না, বাঁকা আঙুলে ঘি উঠাতে এসেছি।"

টুগুনের বুঝতে অসুবিধে হলো না, রণবাবু খুব রেগে আছে। তাই কোন কথা না বাড়িয়ে শুধু বললো, "সরি দা, আমি খুব অসুবিধার মধ্যে ছিলাম।"

"সুবিধা অসুবিধা বুঝি না। তোমরা বুঝো না কেন, আমরা কী নিজেদের স্বার্থে কাজ করছি নাকি? সময় নেই। যা করার তাড়াতাড়ি করো।"

টুগুন রণবাবুদের চেয়ারে বসতে বলে ভিতরে গেলো। এরমধ্যে তার বোনকে দিয়ে চা-পানির ব্যবস্থা করলো।

রণবাবু ও তার সাগরেদ চা-বিস্কিট খাচ্ছে। সিগারেট ধরিয়েছে, গোল্ডলিফ। সিগারেট ফুঁকে আর চা-এর কাপে চুমুক দিচ্ছে। রাগ একটু কমেছে বোধহয়। এরমধ্যে টুগুন তার মানি ব্যাগ আর তার কাজের কাগজপত্রগুলো হাতে নিয়ে ভেতর থেকে বের হয়ে এলো। রণবাবুর কাছ ঘেঁষে বসে তার কাছে ক্ষমা চাইলো এতদিন টাকা দিতে না পারার জন্যে।

রণবাবু বললো, "ঠিক আছে। তুমি নতুন ঠিকাদার বলে আমরা এবার কিছু বললাম না। ভবিষ্যতে যাতে আর এরকম না হয়।"

টুগুনও "ঠিক আছে" বলে তার দুরবস্থার কথা বুঝাতে চাইলো। কাগজপত্রগুলো দেখিয়ে বললো, "দাদা, দেখুন, অফিস ও ইঞ্জিনিয়ারের ভাগগুলো পরিশোধ করতেই আসল মূলধনটাও চলে গেছে। বড় লস হয়ে গেছে। তাই আপন লোক বলে আপনাদেরকে এবার 'পিসি' দিতে পারিনি।" রণবাবু টুগুনের এসব কথা শুনতে খুব আগ্রহী বলে মনে হলো না।

বললো, "সেসব ঠিকাদারের কাজ। আমরা অতসব বুঝি না। আমরা জনগণের অধিকার রক্ষায় কাজ করি। সেই কাজে তোমাদের সবার সহযোগিতা দরকার।"

রণবাবু আরো বললো, "আমরা কত ঝুঁকি নিয়ে এসব কাজ করি, তোমাদের এটা বুঝা উচিত। জনগণের সামগ্রিক স্বার্থে তোমরা দু'এক পয়সাও ত্যাগ করতে পারো না কেন? দুঃখিত, আমাদের খারাপ কথা বলতে হচ্ছে।"

টুগুন বুঝতে পারলো, কোন ব্যাখা বিশ্লেষণ কাজে আসবে না। তাদের মন পাথর হয়ে গেছে। নিথর পাথরে জল ঢেলে আর কোন ফুল ফুটানো যাবে না। টুগুনের মনের অতল গভীর থেকে কান্নার ঢেউ আসছে। কোনমতে কান্নার চাপ ধরে রেখে তার মানিব্যাগ থেকে টাকাগুলো বের করছে আর গুনছে। তারপর আবার মানিব্যাগে ঢুকাচ্ছে। মন চাচ্ছে না টাকাটা দিতে। মানসিক ভারসাম্যহীন লোকের মত টুগুন মানিব্যাগ থেকে টাকাটা বারবার বের করছে আর ঢুকাচ্ছে। অন্যদিকে রণবাবু ও তার সাগরেদ একদৃষ্টে টুগুনের দিকে চেয়ে আছে। তারা মনে মনে ভাবছে, টাকার প্রতি মানুষের কী মায়া! জনসেবার জন্যে এক পয়সাও স্বেচ্ছায় দিতে রাজি নয়। কী কৃপণ লোক! সে এক অন্যরকম আবহ সৃষ্টি হলো। কোন কথা নেই। সবাই চুপচাপ।

"টুগুন বাবু, তাড়াতাড়ি করো। আমাদের উঠতে হবে।" রণবাবু বলে উঠলো।

টুগুনের করার কিছুই নেই। চুপচাপ করে মাথানিচু করে পাঁচশত টাকার একটা বান্ডেল রণবাবুর হাতে বুঝিয়ে দিলো। আর সঙ্গে সঙ্গেই হো হো করে কেঁদে উঠলো। রণবাবুকে কিছু বলতে চাইলেও কান্নার স্রোতে কোন কথা বের করতে পারলো না।

ওদিকে রণবাবু নির্বিকার চিত্তে টাকাটা গ্রহণ করে বললো, "টুগুনবাবু, তোমার মত কিপটে ঠিকাদার জীবনে দেখিনি। কিপটামির একটা সীমা আছে। কেবল নিজের জন্যে নয়, জনগণের জন্যেও একটু ভেবো"। এই উপদেশ দিয়ে রণবাবুরা দপদপ করে চলে গেলো।

সংবাদটা শুনে তিনদিন পর অমগদ চাকমা টুগুনের বাসায় গেল। অমগদ টুগুনকে বললো, "লাভ-ক্ষতি জীবনের অংশ। পাহাড়ে ঠিকাদারী করলে 'পিসি' দিতে হয়। এটাও ঠিকাদারি ব্যবসার অংশ। এসব মানতে না পারলে ঠিকাদারি ব্যবসা করা যাবে না"।

টুগুন চুপচাপ। অমগদ যা বলছে নীরব শ্রোতা হয়ে তা শুনছে। অমগদ প্রশ্ন করলো, "ঐ দিন শুধু শুধু রণবাবুদের সাথে নাটক করতে গেলি ক্যা? রণবাবু তো বলে বেড়াচ্ছে তুই নাকি হাড়ে হাড়ে কিপটে ঠিকাদার। লোক হাসাচ্ছিস কেন?"

টুগুন আর চুপ থাকতে পারলো না। বললো, "আমি লোক হাসাতে যাবো কেন? কিপটে হবো কেন? তুই কী জানিস, আমরা ঠিকাদাররা বছরে কী পরিমাণ টাকা পাহাড়ের রাজনৈতিক দলগুলোকে 'পিসি' (চাঁদা) দিই? ওই চাঁদা দিয়ে ওরা কী করে? ওরা জনগণের কোন সেবা দিচ্ছে? তুই কী গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারিস, ওরা আমাদের দেওয়া টাকায় অস্ত্র গোলা-বারুদ কেনে না? ঐ অস্ত্র গোলাবারুদ কী জনগণের অধিকার রক্ষার জন্যে? তুই কী বলতে পারবি, আমার দেওয়া ঘামঝরা টাকায় ওরা অস্ত্র কিনবে না? তুই কী গ্যারান্টি দিতে পারবি, ঐ অস্ত্র কোন জুম্ম ভাইবোনের প্রাণ কেড়ে নেবে না? তুই কী অস্বীকার করবি, আমরা ঠিকাদাররা জেএসএস-ইউপিডিএফকে যে পরিমাণ টাকা দিই সে টাকা দিয়ে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করছি না? কোথায় আমাদের বিবেক? মারামারিতে টাকা দিতে একটুও বিবেক দংশন করে না?"

অমগদ একসাথে এতগুলো প্রশ্ন কখনো শুনেনি। জবাব দেওয়ার মত উত্তরও তার জানা নেই।

বললো, "টুগুন, স্বীকার করি, ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি জিইয়ে রাখার জন্যে ঠিকাদার হিসেবে আমিও দায়ী। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্যে, পেটের দায়ে ঠিকাদারি করতে হচ্ছে। কিন্তু....."

"কিন্তু কী?" টুগুন জিজ্ঞেস করে।

অমগদ আমতা আমতা করে কী যেন বলতে চাইলো। বুঝতে পারছে না কী বলবে।

টুগুন আবার জিজ্ঞেস করে, "বলো তো কোনটা বেশি প্রয়োজন? বেঁচে থাকা নাকি বিবেক দংশন হতে মুক্তি পাওয়া?"

সমকালীন গল্প

আত্মহত্যা

হরি কিশোর চাক্‌মা

সত্যিকারভাবে না হলেও একটা আদর্শের আত্মহত্যা ঘটালো সমরেন্দ্র নাথ। দীর্ঘদিন ধরে ভেবেছে কীভাবে আত্মহত্যা করা যায়,ট্রাকের নীচে, ফাঁস লাগিয়ে, নাকি কোনো বড় দালানের ছাদে উঠে ঝাঁপ দেওয়া যায়। কিন্তু যদি মৃত্যু না হয়ে আহত হয়ে বাঁচতে হয় তাহলে কী অবস্থা হবে তা ভেবে আর শরীরী আত্মহত্যা করা হয়নি। সেটা না করে শেষ পর্যন্ত আদর্শের আত্মহত্যা ঘটলো। তবে সমরেন্দ্রর ইচ্ছা স্ত্রীকেও আত্মহত্যার পথে নিয়ে যাবে। কারণ তার জন্যই তো আত্মহত্যার সিদ্ধান্তটা নিতে হয়েছে। স্ত্রীই সমরেন্দ্র'র আত্মহত্যার প্ররোচনাকারী!! যৌনরোগ যদি হয় অবশ্যই স্ত্রীর শরীরেও তা ঢুকাতে হবে! গভীর রাত। ঢাকার একটি অভিজাত হোটেলে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় শুয়ে আছে সমরেন্দ্র। পাশে একটি অচেনা যুবতী। একটু আগে সমরেন্দ্র জীবনে প্রথম পরনারীর সংগম উপভোগ করেছে। শরীর কেমন অবশ অবশ লাগছে। যদিও নেশাটা হয়েছে প্রচণ্ড। হবেই না কেন। সেই কবে ভার্সিটি জীবনের বন্ধু ফারুকের সঙ্গে নেশা করলো। ফারুক তাকে বলেছে, দোস্ত, তুই তো স্টুডেন্ট লাইফে খুব শান্ত ছিলে। এখন দেখছি কথায় কথায় খিস্তি খেউর করছো? পারিবারিক কোনো ঝামেলা হয়েছে নাকি?

প্রায় পনের বছর আগে সমরেন্দ্রর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে নিরালার। বিয়ের আগে ছয় মাসের মতো প্রেম। ঠিক প্রেম না বলে বোঝাপড়ার সময় বলাই ভালো। তখন নিরালার সন্দেহপ্রবণতা রোগটা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি সমরেন্দ্র। কিন্তু বিয়ের পরপর শুরু হয় সন্দেহ বাতিক। সমরেন্দ্র কোনো নারী, এমনকি কন্যার বয়সী কোনো মেয়ের দিকে তাকালেও সন্দেহ করে নিরালা।

সমরেন্দ্র লেখালিখি করে বেশ সুনাম কুড়িয়েছে। সে কারণে মানুষ মোটামুটি চেনে জানে। নানা বয়সের নারী পুরুষ তার লেখার ভক্ত। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতি নিয়ে লেখা বিভিন্ন পত্রপত্রিকার উপসম্পাদকীয় আদিবাসীদের আকৃষ্ট করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের উপর সেনাবাহিনীর অত্যাচার নির্যাতন, প্রশাসনের আদিবাসী আর পার্বত্য শান্তিচুক্তি বিরোধী কর্মকাণ্ড, সেটেলার বাঙালিদের ভূমি দখল, আদিবাসী নারী ধর্ষণ নিয়ে সমরেন্দ্র নিয়মিত লিখে এখন আদিবাসীদের কাছে অন্যরকম এক আদর্শ।

সেই সমরেন্দ্র কিনা তার নিজের আদর্শের আত্মহত্যা ঘটালো। সমরেন্দ্র ছোটবেলা থেকে ছিল একটু লাজুক স্বভাবের। স্টুডেন্ট লাইফে কিছু সহপাঠী বা জুনিয়র মেয়ের সঙ্গে মিললেও তেমন ঘনিষ্ঠভাবে কারো সঙ্গে মিশেনি। কয়েকজনকে ভালো লাগলেও প্রেমের প্রস্তাব দেওয়ার মতো সাহস ছিল না। নারী বিষয়ক কোনো কেলেংকারী নিয়ে তার শত্রুরাও তাকে কোনো কিছু বলতে পারেনি। সেই সমরেন্দ্র স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে রীতিমতো সংসারী জীবনে এসে কিনা পরনারীর সঙ্গে রাত কাটাচ্ছে!

সমরেন্দ্র নাথের মনে মনে একটু অনুশোচনা জাগলেও তাৎক্ষণিক স্ত্রী নিরালার কথা ভেবে মনে মনে তৃপ্তি অনুভব করে এই কারণে যে, সে যখন সরল মনে কোনো নারীর দিকে তাকায় তখন কেন নিরালা সন্দেহ করে। স্ত্রীর সন্দেহ প্রবণতার কারণে ফেসবুক পর্যন্ত বন্ধ করতে হয়েছে। নিরালার সন্দেহ ফেসবুক খুললে সমরেন্দ্র অন্য নারী, কন্যাসম মেয়েদের সঙ্গে চ্যাটিং করবে আর তাকে অপছন্দ করবে। অথচ নিরালা নিজে ফেসবুক ব্যবহার করে এবং অনেকের সঙ্গে সমরেন্দ্রর সামনে চ্যাটিং করে।

সমেরেন্দ্র আরও একটা বিষয় ভেবে সুখবোধ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক রাজনৈতিক নেতারই তো নারী কেলেংকারীর কথা শোনা যায়। মন্ত্রী, এমপি, চেয়ারম্যান কার না আছে ছোটখাটো নারী কেলেংকারী। আর দেশের বড় বড় মন্ত্রীদের তো এসব কেলেংকারী অহরহ শোনা যায়। সেখানে সামান্য সমরেন্দ্রর নারী কেলেংকারী যদি কেউ জেনে ফেলে তাতে তার কী আসে যায়। যদি জানা জানি হয় বরঞ্চ নিরালার প্রতি একটু প্রতিশোধও নেওয়া যাবে। নিরালা কথায় কথায় পৃথক হয়ে যাওয়ার কথা বলে। কিন্তু সমরেন্দ্র সামাজিক সম্মানের কথা ভেবে কিছু করতে পারে না। ঘটনাটা যদি জানাজানি হয়ে যায় তা হলে নিরালা কী করবে তা ভেবে মুখে একটু হাসি ফুটে উঠে।

এমন সময় বিছানায় অচেনা নারীর নড়াচড়া সমরেন্দ্রর ভাবনায় ছেদ ফেলে দেয়। সে বি-ছানা ছেড়ে বাথরুমে গিয়ে একটু জল বিয়োগ করে আয়নায় নিজের চেহারা দেখার চেষ্টা করে। মনে মনে ভাবে, রাজনৈতিক নেতারা খুন-খারাবির নির্দেশ দেওয়ার পর এভাবে নিজের চেহারা আয়নায় দেখে কি? যদি দেখে থাকে তাহলে তারা নিজেদের দানবের মতো দেখে, নাকি সত্যিকার নেতার মতো দেখে। যার নির্দেশে একজন মানুষ হয়ে উঠে দানব আর অন্য একজন রক্তমাংসের মানুষকে হত্যা করতে পিছপা হয় না!

সমরেন্দ্র আরও ভাবে, সে তো নিজে নিজের আদর্শের আত্মহত্যা ঘটালো। যে আদর্শ ছোটবেলা থেকে লালন করে এসেছে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর তাকে হত্যা করতে সময় নিলো মাত্র এক রাত। আর যে সব নেতা একটা জাতির আদর্শকে হত্যা করতে নানা চলছাতুরীর আশ্রয় নিচ্ছে আর দেশপ্রেমের কথা বলছে। নেতাদের কি তার মতো সামান্য অনুশোচনা হচ্ছে না? নাকি বিপক্ষ দলের কথা ভেবে তৃপ্তি পাচ্ছে, যেভাবে সে নিজে স্ত্রীর কথা চিন্তা করে তৃপ্তিবোধ করছে?

সমরেন্দ্র চিন্তা করে আত্মহত্যা কত প্রকার। স্বশরীরে আত্মহত্যা, আদর্শের আত্মহত্যা, জাতির আত্মহত্যা!!! না না, জাতির আত্মহত্যা ঘটতে পারে না! যদিও অনেক নেতা জাতীয়তাবাদী কথা বলে জাতিকে আত্মহত্যার পথে নিয়ে যায়। রাজনৈতিক নেতারা কি ছোঁয়াছে যৌন রোগের মতো সমাজে আত্মহত্যার বীজ রোপন করছে না? সমরেন্দ্র যেভাবে স্ত্রীকে রোগাক্রান্ত করার চেষ্টা করছে নেতারা কি সেভাবে তরুণ-যুবকদের কাছে রোগ ছড়িয়ে দিচ্ছে না? আদর্শহীন নেতা নেত্রীর পেছনে জড়ো হওয়া তরুণ-যুবকরা, রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা কি নিজেদের আত্মহত্যাকারী বলে চিন্তা করে না? এসব যদি চিন্তা না করে তাহলে সমরেন্দ্রর আজকের আদর্শের আত্মহত্যা কি বৃথা যাবে না? প্রতিশোধ নেওয়া হবে না স্ত্রীর প্রতি?

সমকালীন বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি গল্প

আমাদের সামনের রাস্তায় যেদিন থেকে বাস চলা শুরু করলো

কুঙ্গ থাঙ

আমাদের সামনের রাস্তায় প্রথম যেদিন বাস চলল সেদিন আমরা ভাবলাম পৃথিবীটা আক্ষরিক অর্থেই ছোট হয়ে আসছে, খুশি হলাম, এবং মাত্র আধমাইল দূরবর্তী আদমপুর বাজারে যাবার বাসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে বুঝলাম প্রখর রৌদ্রে বসে থাকার মধ্যেও আনন্দ আছে। তাছাড়া বাসগুলোতে নতুন নতুন হিন্দী গান বাজছিল বলে আরেক ধরনের রোমাঞ্চ অনুভব করলাম মনে, প্রকৃতপক্ষে বাসের চারটি চাকা মানুষকে যার যার গন্তব্যে নেয়া ছাড়াও আর কি কি করতে সক্ষম উপলব্ধি করতে পারিনি আমরা, সেজন্যে মাথায় গতিবিজ্ঞানের বিভিন্ন হিসাব নিকাশ ক্রমাগত ঘুরতে লাগলো, যদিও বাসে উঠামাত্র "মেরা পিয়া ঘর আয়া..." শুনে আমাদের কিছুটা খটকা লেগেছিল, যেভাবে খেতে বসে হঠাৎ ঝাল তরকারির ভেতর মিষ্টি স্বাদ আবিষ্কার করে আমরা চিন্তিত হয়ে উঠি।

এভাবে ঘুম থেকে উঠার আগে পোঁ পোঁ ইত্যাদি শব্দ চিৎকারের নতুন উপনিবেশে জীবনে নতুন মাত্রা এনে দিল, আমাদের কয়েকজন বন্ধু প্রথম কয়েকদিন এমনি এমনি বাসে উঠতো, তারপর গ্রামের শেষমাথায় এসে "ড্রাইভার লামাও! ও ড্রাইভার" বলে তড়িৎ গতিতে নেমে যেতো আর ফিরে আসার পথ হাত-পা শরীর দুলিয়ে "মেরা পিয়া ঘর আয়া..." গাইতে গাইতে ...

পার্শ্ববর্তী তিলকপুরের জনৈক ব্যক্তির শ্রাদ্ধে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে নতুন ফেইচুম পাঞ্জাবি পরিহিত কুঞ্জ খুড়া দৌড়াতে দৌড়াতে সড়কে উঠে কোনরকম বাসে উঠার জন্য পা তোলার সময় ফেইচুমের কোণায় পা দিয়ে ফেললেও সম্ভাব্য লজ্জাকর দুর্ঘটনা থেকে এ যাত্রায় রেহাই পেয়ে যান। তবে স্বল্পবয়সী এক তরুণী যে প্রায় ড্রাইভারের কাছ ঘেঁষে বসেছিল, সে খুড়ার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দিতেই কুঞ্জ খুড়া ভেতরে ভেতরে জ্বলে ওঠেন 'নির্লজ্জ মেয়েছেলে, মিয়াঙের সাথে কেমন গা ঘেঁষে বসেছে, হুহ্!' সিটে বসার পর হাতের বামপাশে বসা লালরাঙা নারীটিকে দেখে তিনি চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন (সেকথা পরে গল্পচ্ছলে আমাদের বলেছিলেন)। এমনই তিনি, এভাবেই বয়ান করে যান জীবনের ছোট বড় নানান অভিজ্ঞতার কথা; এর কিছুদিন বাদে আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না- তার বখে

যাওয়া কুপুত্রকে এরকম একটি বাসের ড্রাইভার বানানোর স্বপ্ন দেখা শুরু করেছেন তিনি। আমরাও স্বপ্ন দেখা শুরু করি, তবে তার পুত্রকে নিয়ে নয়, আমাদের নিজেদের জন্যে, আচ্ছা আমরাও তো দেখতে পারি; আদমপুর বাজার টু মৌলভীবাজার বাসের স্টিয়ারিং ঘুরাতে ঘুরাতে "মেরা পিয়া ঘর আয়া...", আহ্!

কিন্তু বাসের চারটি চাকা আদমপুর থেকে ভানুগাছ, ভানুগাছ থেকে মৌলভীবাজার, মাঙখেইমাঙ থেকে তিলকপুর এবং তিলকপুর থেকে ঘোড়ামারা পৌঁছে দিচ্ছিল। মাত্র ৩-৪ টাকায় এই সেবার মাধ্যমে আমরা অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হলেও এ সেবার মাধ্যমে আমাদের আর কি কি উন্নয়ন ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে প্রথম প্রথম আমাদের তেমন ধারণা ছিল না। যদিও বাসস্ট্যান্ডে উঠতি তরুণ সম্প্রদায়ের ব্যস্ততা দিন দিন বেড়েই চলেছিল, এবং কালো চশমা হাই হিল জুতাওয়ালী দু'একজন অচিনপুরের স্বর্গ থেকে ইন্দ্রাভিশপ্ত অপ্সরার মতো নেমে আসলে তাদের চোখের তারা কেঁপে উঠছিল। আমাদের কুমাড়া সেরকম একজনকে দেখার পর বাড়ী ফিরে জ্বর বাঁধিয়ে বসে। জ্বর তীব্র হলে তার মুখ থেকে নিঃসৃত আশ্চর্য রসদগ্ধ বাক্যরাশির লজ্জায় ও অপমানে, শিয়রে বসা জননী চোখে অন্ধকার দেখেন। আমরাও দেখি, আফসোসে, ইস কেন আমরা দেখলাম না, আমরা কয়েকজন তখন থেকে রোজকার ডিউটি ঠিক করে ফেলি পিয়া ঘর আয়া... এবং আমাদের মধ্যে যাদের পুরোনো প্রেমিকা ছিল, নিঃসঙ্গ দুপুরে উরুৎ ফুরুৎ বাসগুলোর দিকে তাকিয়ে তারা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলা শুরু করলো।

আর রাস্তাঘাটে এ পথ বেয়ে নতুন নতুন চিন্তা-গল্প-হা-হুতাশের বাতাস বয়ে যায় আর আমরা ক্রমশ সমাজ বিবর্তনের সেবক, প্রকাশক, প্রচারক হয়ে উঠি। আমাদের দু'একজনের মামাবাড়ী ডালুয়া বা এরকম বাস-যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কিছু প্রত্যন্ত গ্রামে হওয়ার কারণে আরো কিছু জিনিস পরিষ্কার হয়ে আসে। তাদের অনেকে পুরোনো দিনে মামাবাড়ি যাবার পথে পায়ে হাঁটার, রিকশায় চড়ার দারিদ্রিক ব্যবস্থার নস্টালজিক মহত্ত্বের তত্ত্ব তুলে আমাদেরকে খোঁচা দেয়- সত্যি বলতে কি ওদিকে কোনদিন বাস যায়নি, বলা ভাল বাসস্ট্যান্ড বলে কিছু নেই সে গ্রামগুলোতে। বাস থামলে নতুন নতুন উপনিবেশের মালপত্র, ল্যাগেজ, ঘড়ি, চশমা, পারফিউম কিছুই নামেনা সে পথগুলোতে। পোঁ পোঁ শব্দ নেই, উথাল পাথাল বাতাসও নেই; আমরা যারা 'পোঁ পোঁ'র কাছে, 'পিয়া ঘর আয়া'র কাছে বিনোদিত হই, রক্তের ভেতরে আরেক রক্তের নাচনে শিহরিত হই, তাদেরকে রহস্যময় আলো-আঁধারের ধোঁয়ায় তীরবিদ্ধ করে তারা বলে- "মামাবাড়ীর উঠোনে পা রাখতেই চারপাশে থেকে বন্ধু বান্ধবদের ছুটে আসার সে কী নমুনা, আত্মীয় পরিজনদের যেভাবে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার সে কী নমুনা, কী মায়া, কী টান, কী আনন্দ আহ্ ...।"

ততোদিনে আমাদের সামনের রাস্তাটি বাস সড়কে বিবর্তনের অনেক দিন কেটে যায়। আর আমাদের মধ্যে যাদের মগজে আঁচড় কাটতে কাটতে হঠাৎ হঠাৎ সাদা সাদা কাগজেও

আঁচড় কাটার অভ্যাস ছিল, তাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের বাইরে আরেক ইন্দ্রিয় যেটি ঈশ্বরের কাছ থেকে গোপনে তথ্য পাচার করতো সম্ভবত তারই কল্যাণে বুঝতে শুরু করলো, সমাজ জীবনে কিছু একটা ঘটে চলেছে। ২০-৩০ হাতের তুচ্ছ এই যানবাহনগুলো কিভাবে এই জনপদে নতুন অবতার হিসাবে আবির্ভূত হলো... অবশ্য খুশি কিম্বা আনন্দেরও কমতি নেই, পথগুলো দিন দিন ছোট হয়ে আসলে চারিদিকে সব চেনা-অচেনা রেখাগুলো ঝাপসা হয়ে আসে, আমাদের নিজেদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের হার কমে যায়। আর কষ্ট কম আর সময় বাঁচে বলে আমরা কাঁটাঘেরা বাগানে গোলাপের রূপ-গন্ধসুধায় বিভোর হয়ে বাসের স্পিকারের সাথে সুর মিলিয়ে যাই ''...দিল নে ধড়কে লাগা ....''

হঠাৎ কোনদিন দুর্ঘটনায় দু'একজন আহত হলে বেশ চিন্তায় পড়ে যাই, ভাবি আমাদের মতো ধীরগতির সমাজে বাসগুলোর এতো দ্রুত চলা মনে হয় ঠিক নয়। যতই দিন যায় এভাবে আলাদিন বাসগুলোতে চড়তে চড়তে আশ্চর্য মানুষ, পোকামাকড়, যাদু, বিষ, মধু, শব্দ, সুর, বর্ণ, গন্ধ আমাদের ঘরে ঘরে মনে মনে মগজে মগজে প্রবেশ করা শুরু করে। রক্তের কোষে, মগজের কোষে, চোখের দৃষ্টিতে তা ছড়িয়ে পড়লে আমার আরো গভীর চিন্তায় পড়ে যাই, এ কিভাবে সম্ভব? আমাদের ফসলের রঙ বদলে যায়, গানের সুর বদলে যায়, কথার শব্দ, ভালবাসার নমুনা বদলে যায়, আমাদের ফাগুনের বাতাসে অচেনা স্পর্শ। আমাদের রাত্রির গল্পগুলোতে অন্যরকম গল্পের অনুপ্রবেশ ঘটে। আমাদের জমি হাওরের কাদায় পড়ে থাকে মাছের লাশ, আমাদের ভিটায় পাখিরা আর ডাকে না, আমাদের বৃদ্ধা কৃষাণীর কোমরে গামছার বাঁধন খুলে গেলে আমরা ভাবতে বসি, কষ্ট করে কোমরে গামছা বাঁধার আবশ্যকতা কি?

একদিন 'ক' নগরে ৩ জন মানুষ মারা গেলে 'খ' নগরে মারা যায় ৭ জন। একদিন 'গ' নগরে কোন নারী লাঞ্ছিত হলে 'ঘ' নগরে কোন অফিস পুড়িয়ে ফেলা হয়। একদিন 'ঙ' দেশের কেউ 'চ' দেশে গিয়ে সোনার পদক জিতে এলে 'ঞ' দেশের লোকজন সেই পদক দূর থেকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আর আমাদের গোয়ালঘরে বিকেলের ছায়া পড়ে। দোকানগুলোতে টেবিলের আকার বাড়ে, টেবিলে চায়ের কাপের সংখ্যাও বাড়ে। অনেকে আবার চা'য়ে চিনি কম দেবার কথা বলা শুরু করে "চিন্তায় চিন্তায় ডায়াবেটিস বাঁধিয়ে ফেলেছি, সাবধান না হয়ে উপায় আছে?"

একেকদিন আবার আমাদের কেউ কেউ, নিজেদের বাড়িঘরে চৌর্যশিল্প চর্চার কল্যাণে নতুন পোষাক গায়ে দিয়ে বের হই আর বেদিশা বাসগুলোতে চড়ে বসি- তারপর 'পিয়া ঘর আয়া' শুনতে শুনতে আবারো একবার বেদিশা চক্কর দিয়ে আসার পর মনে হয় আমাদের চোখ-মগজ-জিভ যেন তিনবার এদিক-ওদিক পাক খেয়ে আসলো। পথে নানান কথাবার্তা জ্ঞানগর্ভ আলোচনার সূত্র ধরে ভাবতে বসি, 'আমাদেরকে আসলে আধুনিকতায় দীক্ষা নিতে হবে'। ভাবতে ভাবতে আধুনিকতার উপরে বসানোর জন্য সেরকম

রক্তসম্পর্কের আরেকটি শব্দ খুঁজে খুঁজে গলদঘর্ম হয়ে ভাবি, আসলে বাসের চারটি চাকার কাজ কি কি, আসলে বাসে চড়ে আমরা প্রকৃতপক্ষে কোথায় যাই, বাস কি প্রকৃতপক্ষে আমাদের গন্তব্যে যাচ্ছে নাকি আমরাই বাসের গন্তব্যে যাতায়াত করছি? ভাবতে ভাবতে একদিন ঘুম থেকে উঠে পথে বের হয়ে কিছুক্ষণ হাঁটার পর রোজকার মতো সেদিন পোঁ পোঁ শব্দ না শুনে চিন্তায় পড়ে যাই, পড়তে পড়তে শুনি 'আজ বাস বন্ধ'। বাসগুলো কেন বন্ধ হয়, কেন আমরা কোথাও যেতে চাইলে বাসগুলো আমাদের কথামতো পোঁ পোঁ শব্দে আমাদের সামনের রাস্তায় এসে দাঁড়ায় না, কেন জায়গায় জায়গায় থামেনা? আমরা গভীর চিন্তায় পড়ে যাই। তারপর একদিন এ রহস্য ভেদ করে ফেলি, কিন্তু ততোদিনে আমরা যাবতীয় পুরোনো চিন্তা মাথা থেকে বের করে দিয়ে আরেক চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ি...

চিন্তা করতে করতে মান্ডপে যাই। পালির পুঁথিপাঠ শাস্ত্রতত্ত্ব মাথার একহাত উপর দিয়ে গেলে ঘরে ফিরে টেলিভিশন চালু করি। টেলিভিশনের ঝলমলে পর্দায় বাস এবং বাসের চেয়ে ২০/৩০ গুণ লম্বা কোন ট্রেনের সর্পিল গতিতে আঁকাবাঁকা কুঁ.. উ.. উ.. ঝিক ঝিক.. কুঁ..উ.. উ.. ঝিক ঝিক ছুটে চলা দেখে অতীতের সমস্ত কিছুকে বিস্মৃত করে বিদ্যুচ্চমকের মতো আমাদের মগজের কোষে আরেক উত্তরাধুনিক চিন্তার উদয় হয়, নতুন আফসোস জাগে, "আহা! আমাদের সামনের রাস্তায় কোনদিন কি ট্রেন চলা শুরু হবে?"

* ফেইচুম - ধুতির মণিপুরি সংস্করণ
* মিয়াঙ - অমণিপুরী
* কুমাড়া - জনৈক তরুণের নাম
* ডালুয়া - একটি গ্রামের নাম
* মান্ডপ- মণিপুরিদের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কেন্দ্র
* পালি - ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ ও ব্যাখ্যার আসর

মুল গল্প : শুভাশিস সিনহা
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষা থেকে অনুবাদ : কুঙ্গ থাঙ

সমকালীন গল্প

জুম ঘর ও পূর্ণিমা

তন্দ্রা চাকমা

বাইরে ঝকঝকে একটা মস্ত চাঁদ উঠেছে। জুমঘরে আজ এসে উঠেছে মেনলে ও সাইরু। নতুন জীবনের স্বপ্নে বিভোর দুজনেই। মাত্র গত পূর্ণিমায় এক উৎসবে দেখা। সেটা ছিল মারমাদের পানি খেলা। সাইরু চুড়ি ও পুঁতির মালা কিনতে ও পানি খেলা দেখতে সেখানে গিয়েছিল। মেনলে বাঁশি হাতে বন্ধুদের সাথে ঘুরছিল। তাকে দেখে সাইরু যেমন চুড়ি দেখতে দেখতে থমকে গেল তেমনি মেনলেও বাঁশি হাতে থ। একটু কয়েক পলক দেখে সাইরু একটা লাজুক হাসি দিল। এতেই মেনলে বুঝল মহারানীর তাকে মনে ধরেছে। সে বাঁশিতে হালকা করে মন উদাস করা এক সুর ধরল, দেখল সাইরু কেমন যেন উদাস হল। তার কিছুক্ষণ পর মেনলে বন্ধুদের ডাকে থামল। বন্ধুরা তাকে ডাকছিল আর এক জায়গায় যাওয়ার জন্য। যাবার সময় মেনলে বলে গেল, 'আমাকে ভাল লাগলে আমার জুমঘরে এসো সামনের পূর্ণিমায়।' সাইরু বলল, 'আমি তো চিনি না।" তখন মেনলে বলল, 'ঝরনার ধারে এসো, আমি নিয়ে যাব।' মেনলে চলে যাবার পর সাইরু কিছু চুড়ি ও মালা কিনল। কিন্তু মন পরে রইল মেনলের ভাবনায়। পূর্ণিমায় আবার দেখা হচ্ছে ভেবে মনে তার আনন্দের শিহরণ বয়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ বন্ধুদের সাথে ঘুরে ফিরে সে বাড়ি ফেরার পথ ধরল। সাইরু বাড়ির দিকে ধীরে ধীরে ফিরছিল বন্ধুদের সাথে। পথে বাগানের বুনো ফুল ছিঁড়ে নদীতে ভাসাল জল দেবতার উদ্দেশে যাতে তাদের মিলন শুভ হয়। পরদিন জুমে গিয়ে তার কাজে মন বসে না। সে কাজ করতে করতে আনমনা হচ্ছিল আর ভাবছিল মেনলের কথা। তার ভাই মেনপং এর ডাকে তার হুঁশ ফিরল। মেনপং তার খাবার এনেছে। তার কিন্তু খাবার কথা মনেই নেই। মেনপং তাকে জিজ্ঞেস করল, 'দিদি তোমার কি হয়েছে গো?' কাল থেকেই দেখছি তুমি যেন নিজের মাঝেই নেই। সাইরু বলল 'কিছু হয়নি তো, খাবার রেখে যা আমি সময় করে খেয়ে নিব।'

সাইরু আর পোরা পাড়ায় থাকে। সাইরু কারবারির মেয়ে। মেনলে কাফ্রু পাড়ার হেডম্যানের ছেলে। বর হিসাবে উপযুক্তও। আশেপাশের অন্য গ্রামের মেয়েরা তার জন্য পাগল। কিন্তু তার এতদিন ধরে কাউকে মনঃপুত হয়নি। আজ শুধু কেবল সাইরু-কে মনে পড়ছে। কেন জানি সাইরুর মায়া ভরা মুখটা তাকে বড় টানছিল। সে মনে মনে বলল,

এমন কাউকে তো আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। দেখা যাক, এই পূর্ণিমাতে বোঝা যাবে তার সাথে মনের কতটুকু মিল হয়। মনে মনে মেনলে সাইরুর কথা যত ভাবছিল তত পুলকিত হচ্ছিল। এই দিকে একই অবস্থা সাইরুর, সে দুপুরের ভাত খেয়ে নিল। তার জন্য তার ভাই মেনপং কাল্লং-এ তুলা দিয়ে ভর সকালে ভাত তরকারি রেখে গিয়েছিল। সে ভাত মযা বের করে দেখল তখন ও গরম আছে সব কিছু। সে ভাত আর সবজি-তরকারি ও একটু মিষ্টি লাউ মেশানো কাঁকড়া তরকারি দিয়ে ভাত খেয়ে ছড়াতে পানি আনতে গেল। সে এঁটো থালা বাসন ধুয়ে কলসিতে কুয়ার পানি ভরে আর একটি ছোট হাড়িতে একটু পানি ভরে নিল। সে যাওয়ার সময় দেখে গিয়েছিল কিছু ফুল, সেগুলো ছোট পানির পাত্রে নিল যাতে টাটকা থাকে। সে হাতের কাজ সেরে নিল। বাড়ির সবার জন্য রান্না করে নিজে কাল্লং-এ ভাত মযা ভরল। সন্ধ্যা শুরু হতে বেশি দেরি নেই। সে নতুন ওয়াঙ্কলাই আর পুঁতির মালা পরল, চুল উঁচু করে খোঁপা করে চুলে ফুল গুজিয়ে নিল। হাতে মেলা থেকে কেনা চুড়ি পড়ার পর তাকে পরীর মত লাগছিল।

আকাশে গোল থালার মত চাঁদ উঠেছে। আজ পূর্ণিমা, সাইরু বাবা মার কাছ থেকে ছড়ার কাছে গেল। ছড়ার পানিতে চাঁদের আলো দেখতে দেখতে সে আনমনা হয়ে গেল। হঠাৎ পেছন থেকে কার স্পর্শে সে ঘুরে দাঁড়াতেই মেনলেকে দেখল। মেনলে বলল, 'কতক্ষণ ধরে আছ?' সাইরু উত্তর দিতে দিতে অনুভব করল মেনলে তার দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে আছে। একটু লজ্জায় লাল হলেও সে উত্তর দিল 'এইতো কিছুক্ষণ।' মেনলে একটা ফুল নিয়ে এসেছিল তার জন্য, সে চুলে গুজিয়ে দিয়ে বলল 'চল যাওয়া যাক।' দুজনে গল্প করতে করতে কখন যে জুম ঘরে এসে পৌঁছাল সাইরু বুঝতেই পারল না। জুমঘরে বাঁশের ইজরে দুজনে পা ধুয়ে ফেলল। সাইরু আসার আগে মেনলে জুমঘরে পানি ভাত মযা কিছু ফল তরকারি ও চাল নিয়ে এসেছিল। সাইরু এইসব দেখে অবাক। তারপর বলল 'এই, আমি তোমার জন্য খাবার এনেছি।' মেনলে বলল 'আমি ও এনেছি।' ভিতরে একটা চুলা আর কুপি জ্বলছিল। সাইরু বলল 'বাইরে যা চাঁদের আলো এই কু-পিটার বোধহয় দরকার নেই।' সে কুপি নিভিয়ে দিতেই বেড়ার ফাঁকে চাঁদের আলো চারদিক আলোকিত করল। মেনলে সাইরুর কাছ থেকে ভাত মযা আর তার কাপড়-চোপড় একপাশে রেখে দিল। সে সাইরুর হাত ধরল। সাইরু কাঁপা কাঁপা হাতে তার হাত ধরতে দিল। অন্ধকারে মেনলে তার গরম ঠোঁট একটু ছোঁয়াল, আর সাইরুকে আদরে আদরে ভরিয়ে দিল। সাইরুর মনে হচ্ছিল সে নীল আকাশে পাখি হয়ে উড়ছে, কি ঘটছে কিছুই বুঝতে পারছে না। এইভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেল। তারপর সারারাত কাটল। সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর সাইরু দেখল বিছানায় কেউ নেই, সে একা। শরীর জুমের সুতোয় বানানো কাপড় দিয়ে ঢাকা যা মেনলের মমতায় ঢাকা। সে ঘুম থেকে উঠে বাইরে খোলা ইজরে দাঁড়াতেই দেখল মেনলে কিছু টাটকা মাছ, চিংড়ি ও ফলমূল এনেছে। এসেই বলল 'চলো নাস্তা করি।' দুজনে মিলে ফলমূল ও ভাত দিয়ে নাস্তা সেরে নিল। মাছ আর চিংড়ির

তরকারি রেঁধে রাখা হল রাতে খাওয়ার জন্য। দুজনে মিলে সব কাজ শেষ করে পাশের জুমে হাঁটতে বের হল। দুজনে জুমে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটির পর একটা গাছের নীচে বসলো, সাথে ভুট্টা সেদ্ধ ও কচি মারফা খাওয়া হল। মেনলে বাঁশি বাঁজাতে লাগলো আর বাঁশির সুরে সাইরু নিজেকে হারিয়ে ফেলল অনেকক্ষণ। পরে বাঁশি থেমে যাওয়ার পর সম্বিত ফিরে পেল। এভাবে কিছুক্ষণ সময় কাটানোর পর দুজনে কিছুক্ষণ পরে জুম ঘরে ফিরে এলো ।

চাঁদটা আবার উঠেছে তবে আজ একটু দেরি করে। আজ চাঁদটাকে বড় সুন্দর লাগছে সাইরুর। মনে হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ অন্য ভুবনের। কেন এমন লাগছে তার কোন কারণ খুঁজে পেলনা সাইরু। 'তবে কি এর নাম ভালবাসা?' এইটা ভাবতেই তার কান লাল হয়ে গেল। এইদিকে মেনলেরও একই অবস্থা। তাহলে আজ সব ঠিক করে নেওয়া ভাল বলে মনে মনে ঠিক করল মেনলে। কারণ কাল ফিরে যেতে হবে। যদিও আরও দুই একদিন থাকলে ভাল লাগত।

মেনলে সাইরুর হাত ধরল বলল 'কি ভাবছ এত?' সাইরু বলল 'কি ভাবছি জান চাঁদ তো সবসময় উঠে কিন্তু আজ এত ভাল লাগার কারণ কি বলতো ?' 'আমিও সেইটা ভাবছিলাম' বলল মেনলে। মনে হয় তুমি আছ তাই। সাইরু একটু হেসে বলল 'বোধ হয় তাই।' মেনলে বলল, 'শোন আমি ঠিক করেছি বাকী জীবনটা তোমার সাথে কাটাবো, তোমার কি মত?' সাইরু লজ্জায় অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে থাকল। অনেক পরে বলল, 'ঠিক আছে আমিও রাজী।' মেনলে বলল 'তাহলে আমাদের রাত আজ আরও ভাল কাটবে।' এই ভাবে এক সপ্তাহ কাটার পর জুম ঘর থেকে নেমে এল মেনলে ও সাইরু। তারপর...

[এই গল্পটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, আমাদের জীবন থেকে আসলে সত্যিকার প্রেম হারিয়ে গেছে তা মনে করানোর বৃথা চেষ্টা এটি। গল্পটা আমার সব আদিবাসী সংগ্রামী ভাইবোনদের জন্য উৎসর্গ করলাম।]

সমকালীন গল্প

দুই আঙুলের চিঠি

অডং চাকমা

আজকের লেখাটা খাগড়াছড়ি শহরের ব্রিজের গোড়ার পাশে একটা মোটর সাইকেল গ্যারেজে দুই বন্ধুর মধ্যেকার আলাপ নিয়ে। আলাপের বিষয়বস্তু ছিলো জুম্মদেরই যাপিত জীবনের অব্যক্ত বেদনা নিয়ে সর্বশেষ ঘটনাবলী।

দু'জনের নাম কী জানা হয়নি। তাই তাদের একজনের নাম দিলাম অমগদ চাকমা আর অন্যজনের নাম উরিপ্প্যা চাকমা। তাদের দু'জনের আলাপ থেকে যা উদ্ধার করা গেছে, সেখান থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছি অমগদ চাকমা পেশায় ঠিকাদার আর উরিপ্প্যা চাকমা অ্যাক্টিভিস্ট যাকে প্রচলিত ভাষায় বলা যেতে পারে রাজনৈতিক কর্মী। আলাপের ধরন থেকে এ-ও অনুমান করতে পেরেছি, অমগদ চাকমাও এক সময় রাজনৈতিক কর্মী ছিলো। সময়ের বিবর্তনে সে আজ ঠিকাদার আর উরিপ্প্যা এখনো রাজনৈতিক কর্মী। তবে সে রাজনৈতিক কর্মী হলেও যেখানে শুরু হয়েছিলো সেখানে তার অবস্থান স্থায়ী হয়নি। সহজ ভাষায়, উরিপ্প্যা হলো দল বদল করা রাজনৈতিক কর্মী।

বিজুর পর ঐ গ্যারেজে অমগদ চাকমা ও উরিপ্প্যার মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ হলো বলে মনে হলো। সেদিন অমগদ চাকমা মেরামতের জন্যে তার মোটরবাইকটা গ্যারেজে নিয়ে এসেছিলো। মেরামত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে মোটরবাইকের গ্যারেজে অপেক্ষা করছিলো। এমন সময় পেছন দিক থেকে উরিপ্প্যা এসে তার কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে বললো, "হেই, তুই এখানে একমনে বসে কী করছিস?"

অমগদ একটু উচ্ছ্বাস নিয়ে উরিপ্প্যাকে বললো, "আরে তুই! কেমন আছিস?"

উরিপ্প্যা কোন রাখঢাক না করে বললো, "কেমন আর থাকবো! এখন নৌকায় দাঁড় টানি। এছাড়া কী আর উপায় আছে?"

অমগদ বললো, "তা তো জানি। তাতে তুই তো বেশ ভালোই আছিস।" উরিপ্প্যা অমগদকে কথাটা শেষ করতে দিলো না। বললো, "আরে ভালো নেই। নৌকায় দাঁড় টানা কত যে কঠিন কাজ তোরে কীভাবে বুঝাই?"

ঠিকভাবে বুঝতে পারলাম না, উরিপ্প্যা কীভাবে দাঁড় টানে আর নৌকায় দাঁড় টানার বিনিময়ে কী কী পায়। তবে দু'জনের আলাপ থেকে এটুকু বোঝা গেলো, একসময়

জেএসএস সমর্থিত পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কর্মী ছিলো। জেএসএস তথা পাহাড়ের রাজনীতির দুরাবস্থার কারণে সে না পারে গ্রামে যেতে, না পারে শহরে থাকতে। শহরে থাকতে হলে পয়সার প্রয়োজন। এই দুরাবস্থায় বেঁচে থাকার জন্যে কিছু একটা পাওয়ার আশায় জেএসএস বাদ দিয়ে ক্ষমতাসীন দলে যোগ দিয়েছে। মনে হলো, সে এখন টেন্ডারবাজি করে।

অমগদকে বললো, "আমি তো জানি। তোর হাতে এখন বেশ কিছু ভালো কাজ আছে। যে যাই বলুক, তুই ঠিকাদারি করে পয়সা কামাচ্ছিস। স্বাধীনভাবে বেঁচে আছিস। বেঁচে থাকার জন্যে অন্তত আমার মত তোকে লড়াই করতে হচ্ছে না।"

"দোস্ত, তুই পড়স নাই যে নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ওপারেতে আছে যত সুখ আমার বিশ্বাস।" অমগদ উরিপ্প্যাকে আরো বললো, "সবই ভুল। জাতি হিসেবে আমরা এখন মহাভ্রান্তি বিলাসে ডুবে আছি। স্বাধীন নয়, কত পরাধীন হয়ে, কত মান-মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে ঠিকাদারি করছি। দুঃখের কথা তোরে কীভাবে বলি?"

উরিপ্প্যা মনে হয় যেন কিছু না বুঝে জিজ্ঞেস করলো, "তোর আবার মান-মর্যাদা, স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয় কেন?"

অমগদ কোন উত্তর না দিয়ে তার পকেটে থেকে একটা হলদে খাম বের করলো। খামটা এমনভাবে ভাঁজ করা মুখটা আঠা দিয়ে লাগাতে হয়নি। খামটা খুলে দু'আঙুলের মত ছোট্ট একটা চিরকুট বের করলো। উরিপ্প্যাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "এটা কী জিনিস, চিনিস?"

"হা হা হা। সেটা আবার কী! চিরকুট।" উরিপ্প্যা না চেনার ভান করে উত্তর দিলো।

অমগদ একটু উত্তেজিত হয়ে বললো, "আরে বুদাই, চিরকুট না। এটা হলো দুই আঙুলের চিঠি। তুইও কত লিখেছিলি মনে নেই? দুই আঙুলের চিঠি দিয়ে তোর দাদারা আমার জন্যে অপেক্ষা করে কমলছড়ি বটতলিতে। চারটার মধ্যে পৌঁছতে না পারলে মাথার খুলি উড়ে যেতে পারে।"

"হা হা হা। এখন একটু বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমি তো অনেক আগেই চিরকুট লেখা বন্ধ করে দিয়েছি। তার বদলে এখন নৌকায় দাঁড় টানি।"

অমগদ উরিপ্প্যার সাথে আর বেশি কথা বাড়ালো না। সারসংক্ষেপ করে অমগদ যা বললো সেটা হলো এরকম :

"সে তার পাঁচ বছরের ঠিকাদারী জীবনে অনেক দুই আঙুলের চিঠি পেয়েছে। ইদানিং এই চিঠির সংখ্যা আরো বেশি বেড়েছে। তিনটা গ্রুপই (সন্তুজ-গুন্ডুষ-ফান্ডুস) দুই আঙুলের চিঠি লেখে। যার যে এলাকায় প্রভাব বেশি সে এলাকায় বেশি লিখে। দুই আঙুলের চিঠিতে সংগ্রামী শুভেচ্ছা জানানো হলেও মূল বিষয় 'সহযোগিতা', সহজ প্রচলিত ভাষায়

’চাঁদা’। চাঁদা দিতে দিতে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। দুই আঙুলের চিঠির দৌরাত্ম্যে সৎভাবে ঠিকাদারি করা সম্ভব নয়। যার কুফল জনগণকে ভোগ করতে হয়। ভাঙা রাস্তা, ভাঙা বাড়ি, ভাঙা সেচ ড্রেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কোন একটা জায়গায় এক একটা ইট কুড়ালেই দুই আঙুলের চিঠি আসে। নিজের বাড়ি বানালেও এখন দুই আঙুলের চিঠি আসে। দুই আঙুলের চিঠিতে অনেক টাকা জমে। টাকা জমলে অস্ত্র আসে, গোলা বারুদ আসে। অবশেষে অস্ত্র-গোলা বারুদ ভ্রাতৃঘাতী হানাহানিতে ব্যবহার হয়। সংঘাত জিইয়ে থাকে। এতে অনেক তাজা প্রাণ ঝরে, রক্ত ঝরে। অশ্রু ঝরে। বাঘাইছড়ির দুই বছরের শিশু অর্পিরা মরে। বিচারের বাণী নিভৃতে কেঁদে মরে। জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার? সে তো এখন সন্তুজ-গুন্ডুষ-ফান্ডুস‘দের মুখের ফাঁকা বুলি।”

উরিপ্ল্যার প্রশ্ন, “তাহলে দুই আঙুলের চিঠি লেখা বন্ধ করার ব্যবস্থা করলে তো হয়।”

অমগদ’র প্রশ্ন, “কীভাবে?”

“ইট, লোহা, বালি, সিমেন্ট, কংকর, পাকা রাস্তা, কাঁচা রাস্তা, গাছবাঁশ ইত্যাদি দুই আঙুলের চিঠি লেখায়। এসব পাহাড়ে বন্ধ করলেই তো সব ল্যাটা চুকে যায়”।
অমগদ’র প্রশ্ন, “সত্যি যায় কি?”
উরিপ্ল্যা চুপচাপ।

অবশেষে অমগদ দুই আঙুলের চিঠির সমীকরণ মেলায় এভাবেঃ দুই আঙুলের চিঠি = অনুন্নতি+জনদুর্ভোগ+ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত++...।’’

অতএব, দুই আঙুলের চিঠি বন্ধ হওয়া জরুরি।

জুম পাহাড়ের গল্প : মা বাবার অবাধ্য ছেলে

অমিত হিল

বর্ষাকাল। সারাদিন মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। সূর্যের আলো দেখা মেলেনি সেদিন। তাই গ্রামের চাষি মানুষগুলো সন্ধ্যা নামার আগে রাতের খাবার সেরে যে যার ঘরে ল্যাম্প এবং চেরাগের আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ছোটনদের বাড়িতে এখনো নিভি নিভি বাতি জ্বলছে। সবাই জেগে পিচপিচ কি যেন কথা বলছে!

ছোটন পরিবারের বড় সন্তান। একবছর আগে চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে ভর্তি হবার পরপরই নিজের পছন্দের বাল্যকালের প্রেমিকাকে পারিবারিক সম্মতিতে বিয়ে করেছে সে। ছোটনদের বাড়িটা খাগড়াছড়ির জেলাধীন পানছড়ি উপজেলার শান্তিপুর গ্রামের দক্ষিণে। স্রোতমান চেঙী নদীর পাড় ঘেঁষে গড়ে উঠা গ্রামের দৃশ্যটা অপূর্ব মনোরম। গ্রামের পিছনে খোলা ধানের আবাদি জমির মাঠ। কিছু দূরে পশ্চিমে মেঘের সাথে হেলানো সবুজ পাহাড়।

এক সপ্তাহ আগে ছোটন বাড়িতে এসেছে। শুনেছে পাহাড়বাসীরা নিজেদের পিতৃ-মাতৃভূমি ছেড়ে ভারতে শরণার্থী হতে যাচ্ছে। পাহাড় তখন যুদ্ধ সংঘাতে অমানবিকভাবে বিপর্যস্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল পড়ুয়া ছাত্ররা একত্রিত হয়ে মিলিত সভা করেছে। অনেকে বাড়িতে ফেরার পরপরই পড়াশোনা ছেড়ে জাতীয় মুক্তির জন্য শান্তিবাহিনীতে যোগ দেবে সভাতে এমন বলেছে। ছাত্ররা এও বলেছে, যেখানে জাতির মুক্তি নেই, স্বজাতির মানুষগুলো একরাত নিরাপদে ঘুমাতে পারছে না সেখানে আমাদের পড়াশোনা করে কি লাভ! ছোটন সেসব ভালোভাবে মাথায় ঢুকিয়ে বাড়িতে চলে এসেছে ।

ভালোবাসার প্রাণপ্রিয় বউয়ের সাথে বেশ কয়েক মাস পর দেখা। তাই কিছুদিন বাবার কাজে সাহায্য করার পাশাপাশি বউকে নিয়ে নিরিবিলিতে গল্প করছে, খেলছে, মনখুলে হাসছে। দুজনের দুটি হৃদয় যেনো এক সুতায় গাঁথা হয়েছে। গ্রামের লোকজন দুজনকে রাধামন-ধনপুদি নামে ডাকতো। তখনকার সময়ে স্বামী-স্ত্রীর রোমাঞ্চ এতোটা আধুনিক ছিল না, যা ছোটনেরা ছোঁয়া পেয়েছিলো ।

সেই বৃষ্টি ভেজা রাতে হঠাৎ করে গাছ ভেঙে এমনভাবে তাল ঝরে পড়বে কেউই বুঝে উঠতে পারেনি। নিমিষে সব হাসিমাখা আনন্দ অন্ধকার গহ্বরে চির বিলীন হয়ে হারিয়ে যে যাবে তা ছিলো কল্পনাতীত। এ যেনো মৃত আগ্নেয়গিরিতে জ্বলন্ত লালার উদগীরন! হাসি আনন্দের এক গ্রামীণ পরিবারে এমন বিরহের বিচ্ছেদ যে হবে, তাও প্রবল বৃষ্টি

ভেজা রাতে! সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়! ছোটনের মা ঢুকরে ঢুকরে কাঁদছে। ছোটনের বউ হতবাক হয়ে ছোটনের ডান হাতে শক্ত করে ধরে আছে। কি বলবে বুঝে উঠতে পারছে না। হঠাৎ সবকিছু এলোমেলো লাগছে। মা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলছে, তুঙ (ছোটনকে সে আদর করে তুঙ ডাকতো), বাড়িতে এক অন্তঃস্বত্তা কচি বউ, তোমার অসুস্থ বাবা, পড়ুয়া ছোট ভাই আমি তোমার মা এভাবে ছেড়ে চলে যাবে? আমাদেরকে একটুও মায়া হবে না? ছোটনের এক কথা "মা-বাবা আমাকে যেতে হবে। আজকে তারা (সেনাবাহিনী সদস্যরা) আমার বাবাকে মেরেছে, ইচ্ছেমতো। আগামীকাল আমাকে যে মারবে না, বা অন্য আরেক বাবাকে মারবে না গ্যারান্টি কি আছে? আমার জন্মদাতা বাবাকে যারা মেরেছে তাদেরকে আমি ক্ষমা করতে পারি না। আমাকে যেতে হবে মা-বাবা। পরানীকে (ছোটন তার বউকে পরানী ডাকতো) দেখে রাখবেন আমি যতদিন ফিরে না আসি।" ছোটভাই লক্ষীচান, ছোটনের পায়ে জড়িয়ে ধরে বলছে, "দাদা যেও না। তুমি চলে গেলে আমাকে কে লেখাপড়া শেখাবে? কে গ্রামে ঘুরাবে? কে আমার সাথে বালুচরে খেলা খেলবে? দাদা যেও না।" হঠাৎ গ্রামের ছোট ঘরটি হয়ে উঠে বিষাদময়-মরুভূমির নিসঙ্গ রৌদ্দুরের মতো। কিছুক্ষণ পর চেরাগের বাতি নিভে যায়। ছোটন বৃষ্টিভেজা রাতে একাকী বেড়িয়ে যায় জাতি মুক্তির আশায়। মা-বাবার অবাধ্য হয়ে ছোটন যোগ দেয় শান্তিবাহিনীতে। তাকে পোস্টিং দেয়া হয় ভারত-মিজোরাম বর্ডারের দিকে।

২ মাস গত হয়েছে ছোটনের কোন খবর পাত্তা নেই। গ্রামের প্রায় লোকজন আস্তে আস্তে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে শরণার্থী হিসেবে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ছোটনের অপেক্ষায় তাদের পরিবার যেতে পারছে না। এমন সময় ছোটনের একটা চিঠি আসে। ছোটন লিখেছে–

শ্রদ্ধেয় মা-বাবা,
আমার প্রণাম নিবেন। আমাকে জন্ম দেয়া সার্থক হয়েছে কিনা জানি না। আপনাদের অবাধ্য হয়ে চলে এসেছি এই অনিশ্চিত জীবনের পথে। দিনরাত ঘুমহীন হয়ে অভুক্ত শরীরে থাকতে হয়। শরীর অনেক শুকিয়ে গেছে। তবে সাহস এবং উদ্যম এখনো সতেজ ও প্রাণবন্ত। যদি আমার আর কখনো ফেরা না হয় পরানীকে নিজেদের কন্যার মতো করে দেখে রাখবেন এই চাওয়া আপনাদের কাছে। আপনারা আমার জন্য চিন্তা করবেন না। নিজেদের শরীরের প্রতি যত্ন নিবেন। আর গ্রামের লোকজন শরণার্থীতে চলে গেলে আপনারাও চলে যাবেন। আমার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না।

পরানী,

ঘুমহীন অন্তত জেগে থাকা সদা সজাগ মহাসাগরের রাশিরাশি জলবিন্দুর বিশালতা তাতে যে নিবিড় বন্ধনযুক্ত ভালোবাসা,সেসবের চেয়েও বিশাল আমার এই মন, যা শুধু তোমারি জন্য। কিন্তু মানুষের জীবনে এভাবে যে বিজলি ঝিলিকের মতো মেঘ ও বৃষ্টির বিচ্ছেদ

ঘটে যায় বুঝিনি আগে। সবকিছু কেনো যেন হঠাৎ উলটপালট হয়ে গেলো! তোমার ছবিটি সারাক্ষণ বুকে ঝুলিয়ে রাখি। আরো যদি কয়েকটি বছর এক সাথে মিলেমিশে থাকার সুযোগ হতো। আরো যদি শুধু কয়েকটি বছর! পরানী, মা-বাবাদের নিজের মা-বাবার মতো করে দেখাশোনা করবে। তাদেরকে কখনো বুঝতে দিও না, যে তুমি তাদের সন্তানের বউ। আর লক্ষীকে নিজের ছোট ভাইয়ের মতো দেখাশোনা করবে। লক্ষীকে যেকোন প্রকারে যেন পড়াশোনা চালিয়ে নেয়া যায় সাধ্য মতো চেষ্টা চালাবে।
প্রিয় লক্ষী,
আমার উপর তোমার কি রাগ হয়েছে সে রাতে? রাগ করো না। আমি একদিন মুক্তি নিয়ে তোমার কাছে ফিরে আসবো। তোমাকে মুক্তির স্বাদ উপহার দেবো। তখন আবার এক সঙ্গে খেলবো, ঘুরবো। মা-বাবাকে কখনো কষ্ট দিবে না। পড়াশোনা ভালোভাবে করবে। একদিন বড় মানুষ হয়েছে উড়োজাহাজে ঘুরে বেড়াবে। তোমার বুজিকেও নানা কাজে সাহায্য করবে।

ইতি,
সকলের ছোটন

চিঠিটি পরানী, মা-বাবাদের পড়িয়ে শোনায় এবং নিজের জন্য ছোটনের লেখাটা একাকী উঠানের জামগাছের তলায় বসে অমনোযোগী হয়ে পড়তে থাকে। কয়েকদিন পর পরানীর এক পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। এক সপ্তাহ না হতেই কচি খোকার মা হয়ে পরানীকেও চলে যেতে হয় ভারতে। ভারতের করবুকে তারা অস্থায়ী শরণার্থী শিবিরে উঠে। সপ্তাহখানেক পর খবর যায় ছোটন এক ভয়াবহ যুদ্ধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়েছে। ছোটনের মা তৎক্ষণাৎ মূর্ছা যায়। পরানী ভাত পানি খাওয়া ছেড়ে দেয়। এভাবে পরিবারটি নড়েবড়ে হয়ে যায়। দিনদিন পরিবারে অশান্তি, দুঃখ ভর করে। একদিন সবকিছুকে পিছনে সরিয়ে পরানী সাহস সঞ্চার করে পরিবারের হাল ধরে। মা-বাবাদেরকে নতুনভাবে পুরাতন আঘাতগুলো ভুলিয়ে প্রাণবন্ত করে তোলে। লক্ষীচানকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়। এভাবে পরানীর বেঁচে থাকার নতুন সংগ্রামী জীবন শুরু হয়।

জাতি মুক্তির আশায় ছোটনের মতো মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন মেধাবী ছেলেগুলো হয়ে উঠে মা-বাবাদের অবাধ্য সন্তান। অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে দুর্বার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে হাসিখুশিতে প্রাণ দিতেও দ্বিধা করে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের কঠিন বাস্তবতা এভাবে সম্ভাবনাময় অনেক ছেলেকে মা-বাবাদের অবাধ্য করে তোলে। ফিরে দেখি সেসবের দিন।

সমকালীন গল্প

একটি চাকমা গল্প : পরা জিংহানি

উৎপল খীসা

চোত মাস। হাচহাবাচ্যে হরান চেরহিত্যে। আদিক্যে ঝল্লা মারি বোয় যায় ভ্যাপসা গরম আভা। আঙ্গি যার শীত হুনদোর য়েল ভুই বাগ দিয়্যেলি। পানির তিরোজে চরঅ মাদি ধোড় ধোড় ওই ফাদি আগ্যে। দুনো সুদে মাজনত্তুন তেঙ্গা ধার উদোর গুরি হুল ন'পাদন গুরিব জুম্ম চাজবলায়। রেত দিন দম্বলঅ পানি ঢালিনেও আর হুল ন'পাদন তারা।
গেল্লে বজরত্তুন ধুরি মনাবাবে বিচ্চোনত পুরি আগ্যে। হাচচো বেরাম পিড়েলোয়। য়েই বোদ্য ঐ বোদ্য হুব গুরি চেলঅ। নানা পদর দারুঅ হেলঅ। হনঅ হুল ন'পেলঅ। তেঙ্গা পুজে উন যা পানিত গেলাক।

গম হদা হল্যে ইক্কু য়ামিজে বজং শুনে মনা মা। হামঅ লগে ন'পারিনেই হিতহিত্যে ওই আগ্যে তার মন-মেজাজ। যদক দিন যার হুম্বিকহানা বারি উদের তার। ডাঙর পো'বুও মানে 'চোগা' আজি গেলঅ তেদা বজর। বাজারত যেই তে আর ন'ফিরে। য়েতারে উতারে ধুরিনেও হুল ন'পেলাক মনা মা দাগি। চোগাত্তে পারাল্যে উনেও হুব আভিলেজ হেলাক। হিয়ে হিয়ে হলাক, গুয়েঞ্জান পো আর ইগগো ন'অয়!

ইক্কুলত পরানাত্তুন ধুরি নাহি চোগা জাদ বাজেবার হাম গরত্ত। বজং সোজ্য গুরি ন'পাত্ত য়েক্কাও। হারাপ হিজু দেগিলে মুজুঙত পুতিবাদ গত্ত। সিয়ানই তার হাল উইয়্যে- বেক্কুনে সে হদা হলাক।

চোগা আজি যানার পরে সংসারর বোঝাবুঅ য়েই পুজ্জে মনা মা'র মাদাত। য়েনে ভাদঅ রাত চলের। তার উগুরে হামঅ জালা আর অসুখ বিসুখ লাগি থানা... জিংহানির পেরাছাি- নত্তুন বাজিবাত্তে মরণর আবিলেজ হায় মনা মা। হয়, "হদক আর সজ্য গুরি পারে দুগ, মান্যে জিংহানি! য়েক্কা মুরি পাত্তুং, ছাত্তুংগোয়!"

হুক হুক গুরি হাজে মনাবাপ। বিচ্চোনত্তুন মাদা তুলি হয়, "মনা মা, ভাত আগন নি? থেলে য়েক্কা দিবে দেনা..."

গজ গজ গরতে গরতে পাকঘরত যায় মনা মা। যুদিও হারাপ লাগে তার মনাবাবত্তে। গেল্লে তিন দিন ধুরি পেদত ভাত ন'পরন মনাবাব'র। চোগ মু হালুক হালুক ওই পুড়ি আগ্যে...

পিলে ত'লা হুজরেনেই হনঅ বাবদে দিব্যে ভাত পেলঅ মনা মা। নুনঅ বুইয়েমমো ধুরিনেই ভাত্তুন হজলদে হজলদে মনা বাবঅ হায় গেলঅ তে। হলঅ, "ধর হা মনা বাপ"।

হাক্কন পরে ইক্কুলত্তুন ফিরি য়েলঅ চিককো। হলঅ, "মা ভাত হেম। ভাত দে।"

মনা মা হলঅ, "পুত ভাত নেই। দিব্যে গুরি য়েলাক সিয়ুন ত'বাবরে দোঙ। ত'বেই মনা'রে চোল চা পাদেয়ঙ্গে য়েবঅ ন'ফিরে। যা বা' য়েক্কা ত'বেরে হবর ধুরি চাগোই। হিত্তেই য়েধক দিরি অর!"

'মুই ন'বারিম... পাত্তুং নয় হোনেই'- ভুদ ভুদোর চিজি। পেজাল তুলি ঠেং আজারার আর আত হুজুলি চোগঅ পানি মুজের...

মনাবাব'র দ্বি-চোগ বেই ঢের ঢের গুরি পানি ঝুরি পড়ে... মুও ভাত গিলি ন'পারে তে... ভাতপোয় মুজুঙ্গে থিলি রাগ্যে ফেল ফেল গুরি চে থায় দোগিনে সুদো মু গুরি...

শেজ নিয়্যে অভাবর জ্বালা আর পরঅ উগুরে বোজা উই থেবার মনর দুগে হি গুরিবো হুল ন'পায় মনাবাবে...

আজু পিজু আমলত্তুন ধুরি মনাবাপ দাগি য়েলাক ধনে দবদবা। আজু পিজু আমলত মোষ গুরুলোয় ঝরল-বরল গুরি চুলি ইচ্চন তারা। ভাদঅ রাত... অভাব হি জিনিজ- সিয়ানি মনাবাব; মানে স্নেহ হুমোর দাগি হনঅ দিন বুজি ন'পারন। আজু পিজু আমলত নাহি মনাবাব দাগির হুরিবুও গবঅ, তেত্রিশসো মোষ, সাতচল্লিশসো গুরু য়েলাক। ভুই ন'গরত্তাক তারা। জুম গুরি হেয় বুরে ন'য়েদাক। সোনা, রুবো, তেঙ্গা পুজের হনঅ অভাব ন'য়েলঅ। য়েগ হদায় গিরিত্তি ঘরত যা থায় বেক্কানি নাহি য়েলঅ তারার সেক্কে।

পুরোন রাঙামাত্যে সহরর তিন মেল দুগিনদি নাহি য়েলঅ মনাবাব দাগির পুরন আদামান। সেক্কে চাঙমা... জুম্ম উনোর নাহি হানাপিনের হনঅ অভাব ন'য়েলঅ। আদামত গাবুর তোগেলে গাবুর ন'জুদিদাক। মালিয়্যে দাগাদাগি গুরি তারা নাহি জুমঅ ধান, গুচ্যে, সুদো তুলিদাক। জুমঅ উদিলে বিনি চোললোয় পিদে ঢুবিডাক। আদাম্যে পাড়াল্যে মিলি ভাগ্যে চাগ্যে হেদাক। সেক্কে নাহি মানুসসুনো ইদু লোভ, হিংসে, নিন্দে ন'য়েলঅ। তারা য়েলাক উজু সুরুঙয়ে। ন'য়েল বাঙাল ডরফর। ধরা ধুজ্যে গুরি হেদাক দেদাক নাহি তারা সেক্কে বেক্কুনে।

(২)

তুংবালা'রে হুব গুরি হোচ পেদঅ মনাবাবে। য়েগ সমারে ইক্কুলত পড়ত্তাক, যেদাক তারা। বড়গাঙ'র পাড়ে পাড়ে হদক ঘুরত্তাক। সংসমাজ্যে হিলি দুলি বেড়েদাক। রাঙা, ওলোদ্যে, নিল, ধু প, সোজ, বিগুনি... নানা বাবুদোর ঝাড়বো ফুল তুলি ভাজেদাক তারা বড়গাঙত। গোঙামা হায় বর মাগিদাক। পা-পি অবার বর। সুগঅ বর মাগিদাক তারা। দেগিদাক সুগঅ স্ববন। ফুল বিঝু দিন্নে হনে হাত্তুন আগ্যে ফুল তুলি পারে, ফুল ভাজেদি পারে- তার জিদেজিত্তে চুলিদঅ সংসমাজ্যেউনর মুধ্যে। তুংবালা'র ঘুমত্তুন উত্তে দেরি

অলে স্নেহ হুমরে তাত্তে ফুল তুলি রাগেদঅ। চুলত ফুল গুজে গুন গুনেদঅ তুংবালা। গেদঅ, "গাজ ফাকন্দি জুনান যেক্কে উদে ইধোত গুরিস ম'রে..."। স্নেহ হুমর'র চোগে মুয়ে হুজির ঝিলিক বোয় যেদঅ। হোচপানা গমলাগানায় হুব গুরি ধড়ফোরেদঅ তে...

চেরহিত্তেত্তুন হুজির রেঙ্গচাক ভাজি উদিদোঅ পুতপুত্যা জুনপহরমায়...

পুত্তিদিন সাজন্যে মনাবাব'রে বাচ্চে থেদঅ তুংবালা। গাঙপাড়ত রঙ ছুড়িদঅ গাবুর হাল হোচপানার। মিদে বুইয়ের আভায় চিদ জুড়েদঅ। গবে সবে হুজির দিন হাদিদঅ তারার।

জারহাল পরলে দুলি তামাজা চা জেদাক তারা সংসমাজ্যে মিলিনেই। গাবুজ্যে গাবুরির হলহালায় ভুরি উদিদুঅ চেরোপালা।

বারিজেত মাছ ধরত্তাক। হাঙ্গারা তোগেদাক। হদঅ হিজু গরত্তাক। তুংবালা সব সময় মন-াবাব'র হায় হায় থেদঅ। মনাবাবেও তুংবালারে চোগে চোগ রাগেদঅ। সমাজ্যেউনে হিয়ো হিয়ো তারারে নিনে নানান বিগিদি গরত্তাক। মেলা হেবাত্তে মাগিদাক। মু চেবে চেবে আজিদাক তুংবালালোয় স্নেহ হুমোরে।

(৩)

য়েন গুরি আজি রঙে দিন হাদেবারমায় য়েগদিন গদা বানিবার হদা শুনিলাক মনাবাপ দাগি। পত্থম শুনিনেই নাহি আদামত হিয়ো সে সাম্বাদত্তান বিশ্বেজ গুরি ন'পারন। সরহারর হাপ্তেই গদা দিবের চিদেয়ান নাহি তারা ইদু পাগলর ভাজ মাদানা সান মনে উইয়্যে। বেক্কুনো মাদাত ঘুরপাক হেলঅ সাম্বাদত্তান। হেনে সম্ভব সিয়ান- হিয়ো চিদে গুরি হুল ন'পেলাক। বেক্কুনোর সেই য়েগ হদা, "য়েম্বা গাঙঅর পানি নাল হেনে গদা বানি রাগানা? হেনেই বা পানিত্তুন বিদ্দুত বানানা সম্ভব?"

সাম্বাদত্তানত্তে হিয়ে হিয়ে উগুদো রাঙাচান'রে গবা সবা গরলাক। রাঙাচানে সেক্কে চাদিগাং সহরত পড়ত। আই.এ. হেলাজত। সে সুত্তুরে তে পত্রিকা পড়ত। রেডিও হবর শুনিদঅ মাজেচানে। য়েগদিন পুত্রিকা পুরিবাত্তে যেনেই তার গদা বানানার হবরান চোগত পুজ্জে। সঙগে সঙগে বুগ ভিদিরে চিগুদ গুরি উততে তার। মন্যে মন্যে হলঅ, "ওমা ইয়ান হি দিলুং! হাপ্তেই গদা দিল্যে আমা জুম্ম উনোর হি অবঅ?"

গদা দিলে জুম্মোউনর হি পুরিমান হুতি ওই পারে সিয়ানর ভুক্তভুগী ন'অলেও লেগাপড়া গরানার সুত্তুরে তে সিয়ান নিনে আন্দাজ গুরি পারে। ভারদর বিহার রেজ্যেত ময়ুরাক্ষী গাঙত গদা দেনার ফলে সান্তালুনোর হি দজা উইয়্যে সিয়ানদঅ তার জানা হদা। ময়ুরাক্ষী গাঙত গদা দেনার ফল্যে পানি বাড়ি ভালুগগো সান্তাল পুরিবার ঘর ভিদেত্তুন উচ্ছেদ উইয়োন। বুহুত সান্তাল হে নপেনে মারা যিয়োন। অনেগজনে য়েজঅ সঙ দুগে শোগে মানবেতর জিঙহানি হাদাদন। সরহারে হদঅ হিজু দিবের হদা হলেও তারারে সিয়ানি দিয়্যে ন'অয়। ঘর দোর বানি দিবের হদা য়েলঅ। ভুই, গুরু, ছাগল দিবের হদা য়েলঅ। হিচ্চু দে'নঅয় তারারে। হিয়ো হিয়ো নাহি সিয়ানি বেক্কানি মারি

হিয়োনদোই। সেই যে সান্তালুনোর সংসারর হমর ভাঙ্গানা শুরু উইয়্যে পরে আর তারা হিয়ো সোজা গুরি দাড়েবার থিদঅ ন'পেলাক। বন্ধ পেলে আদামত য়েজে রাঙাচানে। আদামত ন'য়ে তে থে ন'পারে। য়াজার ওক তে জুম্ম। আদাম্যে পো। জুম আদাম'র মানুজ। আদামত থে থে যার অব্যেস, অমাঅনা- তাত্তে সহরত থানাআন দুগর। সে সুত্তুরে হোয় যায় রাঙাচানে ইক্কু দুগত আগে। যুদিও তে দুগঅ হাম হদে যা বুজোয় তার হিচ্ছু ন'গরে। দুগ ফেলে সুগ পেবাত্তে তে মাজেমুধ্যে আদামত য়েযে, য়েই পায়। তার আদাম'র বেক্কানি গম লাগে। যেন হোলামেলা জাগা, মিদে বুইয়ের আভা, রোত, ঝড়, ফল পাগোর, হানা দানা, বেড়ানা... নিজো ভাজলোই মনহুলি গবসব মাদানা... তার গম লাগে। তাবাদে ননাবি'দঅ আগ্যেই তার মন পরান জুড়ি । সেনত্তেও তে আদামত য়ে পায়। আদামত ন'য়েই ন'বারে...

য়েবার তে যেক্কা ঝাদিমাদি আদামত য়েলঅ। হো যায় গদা বানানার সাম্বাদত্তান য়েবার তারে ঝাদিমাদি আদামত আনিলঅ...

ইয়ানর ভিদিরে য়েক্কান হদা ন'হলে ন'অয়। ন'নাবিরে ছাড়ি চাদিগাং সহরত পুড়িবের হনঅ ইচ্চ্যে ন'য়েলঅ রাঙা চান'র। সিয়েন নিনেই হয়েকবার মু ফেজেলাংও বাজেয়োন তারা বাব-পোয়। য়েগবার ঘরত্তুন লামিও যিয়্যে রাঙাচানে। মনর দুগে ভাত পানি ছাজ্জে তাবাবেও। পরে মুরুব্বিরে হোয়বুলি বুজে সুজে হনঅ বাবদে উজু গুরি পাজ্জে তাবাবে তারে। সিয়েনি চিদে গুরি রাঙ্গাচানেও শেজমেজ সহরত পুড়িবেত্তে উজু উইয়্যে।

আদামত য়েলে দেজ বিদেজর নানা সাম্বাদ আনে রাঙাচানে। য়েবার য়ান্নে তে গদা বানানার সাম্বাদত্তান। যারে যারে তে সাম্বাদত্তান শুনেল তারা হিয়ো তার হদা লে গরলাক ভিলি মনে ন'অল রাঙাচান'র। ইয়ানদোই তে য়েক্কানা ধান্দাতও পরলঅ। আমক অল। যা ওক, য়েবার নুও অভিজ্ঞতা অলঅ তার। আগ্যে হনঅ সাম্বাদ দিল্যে হুক্কুপ্যে গুরি বিশ্বেজ যেদাক আদাম্যেউনে। য়েবার হিয়ো বিশ্বেজ ন'গরলাক তার হদায়ান।

শিক্ষিত অলেও রাঙাচান হদাআন হিয়ো পাত্তা ন'দিলাক। আদামর মুরুব্বিউনেদঅ ন'দিলাগই। গুরো ভিলিনেই য়েবার তারে উগুদো উরে দিলাক। সেনত্তে গদা বানানা থামেবাত্তে রাঙাচান দাগি হিজু গুরিবের চেনেও শেজমেজ আর হিচ্ছু গুরি ন'পারলাক। মুরে মুরে চক চক গুরি থেলাক তারা। হারর বা হি গুরিবার থায়? যেক্কে আদামর বেক্কুনে উজুসুরুং জিংহানি হাদান... ভ'বুচ্চ্যেউনে ছদ ছাড়া ওই সুগঅ চিদেত মাত্তলে পুড়ি থান... জাদ ভাজি যাদে দেলেও নাগ দাগি ঘুমঅ ছল ধরন... সেক্কে আর হয়েগজন রাঙাচান'র হিইবা গুরিবের থায়? হবাল চবারানা বাদে?

(৪)

জুম্ম উনোর যা ঘুদিবের তা ঘদানা শুরু অলঅ।

বজর ফিত্তে ন'ফিত্তে যেক্কে পানি বারানা শুরু অলঅ সেক্কে হবালত আত দেনা শুরু অলঅ আদাম্যেউনর। চাগালা থিয়্যে আদাম্যে পড়াল্যের হবাল বাজ্জানা শুরু অলঅ। চাদ্যে

চাদ্যে পানি বারি গেলঅ পাবাংপাং। ছড়া, বিল ভুরি পানি ফুলি উদা ধরলঅ। হয়েক দিনোর মুধ্যে পানিত্তলে ডুবি গেলঅ য়েগ য়েগগো য়েল মুড় মুড়ি। চিগোন ডাঙর হিচ্ছু বাদ ন'থেলাক। পজা বিড়ে জায়-জুগোল গরত্তে ন'গরত্তে ডুবি গেলঅ মনাবাপ দাগির "বড় আদাম"। মোষ, গুরু, ছাগল, ছয় সম্পত্তি বেক ডুবি গেলঅ। হিচ্ছু আর বাগি ন'থেলঅ।

গুরু, ছাগল, পুজুপুক্ষী..মানজোর গলা পজা লাজ ভাজানা বারি গেলঅ চেরহিত্যে... রোগ শোগ বাড়িলঅ... মড়াহিজেক, হানাহুদো পড়লঅ... হিয়ো হাররে চেবার হুয়েলাক, ন'থেলাক। মুহুত্বে আদামান ছাড়া ওই পড়লঅ... অম্ব অম্ব গুরি গুরুয়ুন থিগেদ ডুবি মুরি যেলাক...

হয়েক দিনোর মুধ্যে মনাবাব দাগি বেক আড়ে ছত্রসাং অলাক। হিরোত্তুন জিরু অলাক আদাম্যেউন বেক্কুনে। পরান বাজেবার যেনেই বুহুতজনে বেলক অলাক। সারা জিংহানিত্তে আড়াআড়ি অলাক ভেই বোন আত্তিয়-স্বজনে। হুড়োহুরি পুরিনে মনাবাব'র শেজ দেগা ন'অলঅ তুংবালালোয়। ঘাদত্তুন ন'য়ান ছাজ্জে শুনিনেও মনানরে থিদঅ রাগে ন'পারে মনাবাবে। তুংবালা দাগিরে থামেবাত্তে লোড়ে লোড়ে যিয়্যে তে ঘাদঅ মুক্কে। ন'য়ান দুরত ছুড়ি যেনেই আর হিচ্ছু গুরিবার ন'য়েল মনাবাব'র। হবালত আত দেনা ছাড়া!

য়েঞ্জান গুরি ফেলে জানাত্তে তুংবালার উগুরে হুব রাগ উইয়্যে সেদিন্যে তার। হি গরানা দরহার হিচ্ছু বুজি উদি ন'পারলঅ সেক্কে তে...। ম'নে হলঅ তার পানিত ঝাম দিবের... নাকদি মুরিবের... গাঙমুখ্যে যাদে দেনেই মুজুঙ আক্কোলে পুয্যেন-ব্রম্ম হুমোর দাগি। সে বাবদে য়েক্কাতে শেজরক্ষা পেলঅ তে। হনা দরহার- সিন্ন্যে মরনঅ মুয়োত্তুন য়েক্কাত্তে ফিরি ইচ্চেগোয় মনাবাবে।

(৫)

হনঅ বাবদে পরান বাজেলাক বতে মনাবাপ দাগি। হিন্তু সিয়ত যে হাজ বাজিলো মন-াবাব'র- হনঅ দিন আর গম ন'অল। হনঅ হনঅ বোদ্যয়ে হলাক, "মনাবাপ ইয়ান ত'র মরানা পিড়্যে। ত'র ইয়ান লগে গুরি যা পুরিবগোই।"

মনাবাবে হয়, "হি আর গরানা, হবালত থেলে সিয়ান দঅ ভুগঅ পুড়িবুঅ।"

হয়েক দিনোর মুধ্যে মনাবাব'র বড় ভেই ব্রম্ম হুমোর চাঙমা মুড়ি গেলঅ সাঙ্গ পিড়েত ভুগিনেই। মুরিবের হদা মনাবাব মানে স্নেহ হুমোরর। মুরিলঅ ব্রম্ম হুমোরে। হয়দ ইয়ানই জগদর নিয়ম!

সিয়ত যে হমর ভাঙ্গে- হনঅ দিন আর থিদঅ ন'অল মনাবাব দাগির সংসার। সরহারে পুন্নবাসন গুরিবের হদা হল্যেও হিচ্ছু ন'গরে। হিচ্ছু ন'পেলাক মনাবাব দাগি। পেদর জালায় ঝাড়বো আলু, হলাগাজ হেলাক হুব গুরি তারা। য়েগসময় সিয়ানি ন'হুলে দিকপায়ল ওই পরলাক হদক জনে। ভুগে, রুগে আরঅ বুহুত মানুজ মারা গেলাক। আলু

গাদত পুরিনে মারা যেলাক হিয়ো হিয়ো। ন'পারিনে বুহুত মানুজ ভারদত শরনাথি ওই যেলাক। জাদর আজল দুগ বারানা শুরু অলঅ...

(৬)

যদক দিন বিদি গেলঅ তুংবালা উগুরে মনাবাবর রাগ হুমি য়েলঅ। হুব গুরি হোচপেলে যা অয়। য়াজার ওক মিল্যে মানুজ তুংবালা। য়েঞ্জান বিপদত তুংবালারই বা হি গুরিবের থায়? -নিজোরে নিজে পিজোর গরলঅ মনাবাবে। বিশেজ গুরি যিয়ত তে মরত ওনেও নিজে হিচ্ছু গুরি ন'পারলঅ। সিয়োত তুংবালা হি গুরি পাত্ত? যদক য়ে হদানি ভাবে সেদক বেজ তার ইধোত ভাজে তুংবালারে। তুংবালালোয় তার নানান জাগা বেড়ানা, ফিরানা, ঘুরানা, গবমাদানা...। জেদা ওই ফিরি ফিরি য়েজে তা ইদু য়ামিজে। তুংবালা হদক হুইয়ে তারে, "স্নেহ দা, মুই আর দিরি গুরি ন'পারংঅর... ম'রে তুই ঘরত তুলিলঅ..."। ইচ্চে হিল্লে গুরি তুলিলোয় ন'বারে তে তুংবালারে। সেনত্তে নিজর উগুরেই ইক্কু বেজ রাগ ওই তার...

মনা মা'লোয় মেলা অবার আগেদি হুব গুরি তোগেয়ে তে তুংবালারে। ফেনিহুল, চেঙ্গে হুল, মেয়েনি হুল- হনঅ জাগা বাদ ন'থায়। হিয়্যে হনঅ সাম্বাদ দি ন'পারন তার তু-ংবালা'র। য়েম য়েলঅ মনাবাব'র- হাররে আর ন' লবার। ১২ বজর হাদে দিয়্যে তে য়েই সুদো ওই সুদো দি। শেজমেজ অসুখ্যে বুড়অ আজুর চাবত পুড়িনেই তে লোয় পিইয়ে মনা মা'রে। সংসার তাঙ্গে মনা মা লোয়। যে সংসারত তে দুগ বাদে হনদিন সুগ আনি দি ন'পারে।

(৭)

য়েগ দিন হাত্তনত্তুন ফিরিবার পদ্যে সংলা আদামর দ্ব-বধা পদত দেগা উইয়ে মনাবাব'র তুংবালার চিগোন ভেই ধনরাম'লোয়। মনাবাবে পিজোর লোবার আগেদি ধনরামে হলঅ, "তুং বেই দঅ পানিত ডুবি মারা যিয়্যে। আজারিবাগ পার অদে য়ামি বড় বুইয়্যের মুয়ত পুজ্জেই। হুলোত ভেড়েবার আগেদি য়ামা ন'য়ান ডুবি য়িয়্যে। সিয়ত তুং বেবে, মা আর ধংবালা সহ ভালকজন মারা যিয়োন। ধংবালারে ধুরিবাত্তে যেনে তুংবেবে গংয়ারে ভাজি যিয়্যে"।

ধনরামে আরঅ হলঅ, "তারে ত'হায় নিবেত্তে হুব হুজুলি গুজ্জে বেবে ম'রে। ...ঘাদত্তুন ন'য়ান ছাড়িবের আগেদি হুব গুরি চে রুইয়্যে তে ত পত্থান চে। হনঅ তা'রে হজা য়েজস নি! বা মা দাগিও হুব চে রুইয়োন দা ত'রে। সেনত্তে আমা ন'য়ান ঘাদত্তুন ছাত্তে দিরি উইয়্যে। ত'র দেগা ন'পেনে বেবে মুয়ন সিন্নে হুব হালা ওই য়েলঅ..."

সাম্বাদত্তান শুনিনে বড় নিজেস ফেলেলঅ মনাবাবে। হক্কে তেপ তেপ গুরি পহন পানি ফুদ ঝুড়ি পু-ড়িলঅ তে ঠাহর গুরি ন'পারল। চোগঅ পানি ঝোড়েনে দ্বি-জনে দুগর সাগরত ভাজিলাক হদক্কন...

হাক্কন বাদে নিজরে গুচ্ছে নিনেই দুগঅ হালর হদা হলাক তারা আরঅ দ্বিজনে। নুও জাগাত নুও বুস্তি গরানা, নুও সংসার পদানা... নানান সুগ দুগর হদা হলাক তারা। য়েগজন আরঅ য়েগজনরে পিজোর গুরি চেলাক- "হি পেলং য়ামি রাজা, বাদশা, ধরম গুরু হদা শুনি? হি দিলাক তারা আমারে রাজা গুরু মানি? হি অলঅ য়েধক যুদ্ধ গুরি, মানুজ মুরি? হি পেলং য়ামি স্বাধিন বাংলাদ্বেজ পেনেই?চ

ধনরামে হলঅ, নেই দা, মর আর হিচ্ছু নেই। বেক আড়েয়োঙ মুই। মুই বেক শেজ ওই যিয়োঙ... হি নিনেই হি আজায় আর মুই বাজিম?

ধনরাম'রে বুজোয় মনাবাবে। "না ধন, আমাত্তুন বাজা পুরিবুও। আমাত্তুন আর যুদ্ধ গরা পুরিবুও। জুম্মউনোর ভালেদত্তে আমাত্তুন মাদা উজু গুরি দাড়া পুরিবুও। বজংঅরে থামেবাত্তে বেগর জদা ওই লড়া পুরিবুও।"

সাহজে বুক ন'বানে ধনরাম'র। তুও শুনি থায় তে মনাবাব'র হদা। গাবুজ্জে অক্তত মনাবাব'রে বেকভাগ গাবুজ্জেই মানিদাক। আদামত তা হদা ধুরিদাক। তে য়েল ধনরাম দাগির সবন। সবন'র মানুজ।

সুগ দুগর নানান হদা হদে হদে হক্কে পুগ বেল পুজিমে আহলেলঅ বুজি ন'পারলাক তারা। মনাবাবে বেলঅ হিততে চে উদিবের হদা হলঅ ধনরাম'রে।

"ধন, য়েস বেরেচ্ছি" হনেই সিন্নে মনাবাবে ফারক উইয়ে ধনরামত্তুন। তারপর আর হিয়ো হারঅ হবর লোয় ন'পারন। য়েন গুরি ৩০ বজর হাদি গেলঅ। পরা হবাল্যে পরঅ অধিন দুগঅ জিংহানির ঘানি তানদে তানদে...

গদা ওনেই যে দুগর শুরু তার আর শেজ ন'অলঅ হারর। হিয়ো হারর অবার চেনেও ওই ন'পারলাক। স্নেহ হুমরত্তুন পর ওই গেলঅ আপন তুংবালা। যারে হাক্কন ন'দিগিলে তে থে ন'পাত্ত... যারে লোনে তে পত্থম সবন বান্নে বাজিবের... ফুল ওই ফুদিবের চাদিগাঙ... পিত্থিমিত...

দিন যানার সমারে সমারে পর ওই গেলঅ তার সমাজ, ধরম হরম, মানজ্যের রিদি সুদোম, রাজঘরর চিদ্যেচর্যায়ানি। বুদুলি গেলঅ মান্যেলগর হোচপানা। সে ঘুলত পুরি দিন দিন পর ওই যার শেজ সম্বল মনা মা। অভাবে আন্ধার দেগে তে ইক্কু চেরহিত্যে। মরণ বর মাগে য়ামিজে।

তুও মিজে সুগর সবন দেগান রাজাবাবু দাগি। ফুলুফালা ভাজ মাদন চোগ মু হাদি। ঝাপসা লাগে মনাবাব'র য়েই জিংহানি, য়েই পিত্থিমি...

থুম ন'অয় মনাবাব'র দুগর সংসার। পরা জিংহানি...

৭.২.২০১৪
পূর্ব কাজীপাড়া, মিরপুর- ১০, ঢাকা।

শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিমল তিষ্য মহাথেরোর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

শিক্ষা, মানবাধিকার ও বিশ্বশান্তির জন্য নিবেদিতপ্রাণ এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী

মূল: প্রফেসর পি. জে. চাকমা*
অনুবাদ : স্বাগতম চাকমা

ভূমিকা

চাকমা জাতির একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ পরম পূজনীয় শ্রীমৎ বিমল তিষ্য মহাথেরো। তিনি সাধারণ জনগণের মাঝে বিমল ভান্তে বা বিমল ভিক্ষু নামে সমধিক পরিচিত। ঐতিহাসিকভাবে বিপন্ন, অধিকার বঞ্চিত চাকমা জাতির সন্তান হলেও তিনি এখন ভারত উপমহাদেশের স্বনামধন্য বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মধ্যে অন্যতম একজন। বুদ্ধের চিরন্তন মানবতাবাদ ও শান্তির বাণী নিয়ে তিনি পৃথিবীর নানা দেশে মহাদেশে পরিভ্রমণ করেছেন। ধর্মসাধনার পাশাপাশি তাঁর জীবন ও কর্মের একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে দরিদ্র ও ছিন্নমূল আদিবাসী শিশুদের সুশিক্ষা এবং এসব শিশুর জন্য একটি অর্থবহ উন্নত জীবন গড়ে দেওয়ার লক্ষ্যে সৃজনশীল নানা উদ্যোগ ও কর্মপ্রয়াস। সেই সাথে রয়েছে বিশ্বের শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য তাঁর মৈত্রীপূর্ণ নিরলস প্রচেষ্টা এবং বৈশ্বিক নানা উদ্যোগে অংশগ্রহণ। বলা যায়, তিনি একসাথে সমাজের বহু মহৎ কার্য সম্পাদন করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন। নিজের সমাজে এবং বহির্বিশ্বে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের চিরকল্যাণকর অহিংস বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছেন। স্বজাতির উপর শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও জনমত গঠনসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সাথে বিশ্বসম্প্রদায়ের পারস্পরিক জানাশোনা ও সেতুবন্ধ রচনার কাজটিও করে চলেছেন সুনিপুণ দক্ষতায় ও একাগ্রতায়। দরিদ্র, ছিন্নমূল আদিবাসী শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণসহ তথাগত বুদ্ধের প্রদর্শিত পথে সমাজ উন্নয়নমূলক নানা কার্যক্রমও তিনি নিরলসভাবে করে যাচ্ছেন। বর্তমানে তিনি একটি অলাভজনক, ধর্মীয়-সামাজিক উন্নয়ন সংগঠন 'শিশু করুণা সংঘের' প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে তাঁর জনহিতকর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কোলকাতায় তিনি এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। শিশু করুণা সংঘের

তত্ত্বাবধানে এখন কোলকাতার নিউটাউনে 'বোধিচরিয় বৌদ্ধ বিহার' এবং 'বোধিচরিয় সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল' নামে দু'টি শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। বলাবাহুল্য, শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে তাঁর মানব কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য দেশে-বিদেশে সুপরিচিত একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। ধর্ম সাধনার পাশাপাশি সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বিশেষ করে মানবাধিকার, মানবিক সহায়তা, বিশ্বশান্তি এবং মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম তাঁর কাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়। শিক্ষার মাধ্যমে ভারত ও বাংলাদেশের নানা প্রান্তের দরিদ্র আদিবাসী শিশুদেরকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়ে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করে চলেছেন। প্রধানত উত্তর-পূর্ব ভারতের আদিবাসী শিশুরা প্রাথমিক সুবিধাভোগী হলেও জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে অন্যান্য শিশু-কিশোররাও শিশু করুণা সংঘ পরিচালিত স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়ে থাকে। তিনি অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী যাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নতুন প্রজন্মকে আধুনিক ও মূল্যবোধ নির্ভর শিক্ষায় ও জ্ঞানে আলোকিত করার কাজে নিবেদিত। তিনি দরিদ্র ও ছিন্নমূল আদিবাসী শিশুদের জন্য অন্তহীন আশা ও অনুপ্রেরণার উৎস এবং পথ প্রদর্শক। আপন সমাজ ছাড়াও সারা বিশ্বজুড়ে তাঁর অগণিত গুণগ্রাহী রয়েছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিমল ভিক্ষু সাধারণ মানুষ, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং সমমনা সংগঠনসমূহের কাছে উচ্চ প্রশংসিত ও সমাদৃত একজন সমাজ সংস্কারক শুধু নন, তিনি একাধারে বিশ্বশান্তির পক্ষে একনিষ্ঠ প্রচারক ও পথপ্রদর্শক, সুদৃঢ় মূল্যবোধ ও নীতিনিষ্ঠায় ঋদ্ধ একজন দার্শনিক শিক্ষক এবং বুদ্ধের অপরিমেয় মৈত্রী ও করুণার আদর্শে অনুপ্রাণিত একজন ধর্মসাধক। তিনি অজস্র ছিন্নমূল সন্তানের কাছে নবজীবন দানকারী একজন আধ্যাত্মিক পিতাও। এক কথায় বলা যায়, তিনি "নিরাশ্রয় শিশুদের আশ্রয়স্থল, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিশা ও অন্তহীন প্রেরণার উৎস।"

প্রথম জীবন

শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিমল ভান্তে ১৯৪৫ সালের ১২ নভেম্বর বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলাধীন উদোল বাগান গ্রামে সদ্ধর্মপ্রাণ এক চাকমা বৌদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারের পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে তিনি চতুর্থ সন্তান। তাঁর পিতা স্বর্গীয় শ্রী বাত্যা চাকমা একজন অতি সহৃদয় ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। আর স্বর্গীয়া মাতা শ্রীমতি পরাণী চাকমা ছিলেন ধর্ম-অন্তপ্রাণ, উষ্ণহৃদয় ও কল্যাণময়ী চিরন্তন এক মা।

শিক্ষাজীবন ও প্রব্রজ্যা গ্রহণ

শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিমল ভান্তের প্রাথমিক শিক্ষাজীবন শুরু হয় তাঁর নিজ গ্রামে অবস্থিত উদোল বাগান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এরপর তিনি দীঘিনালা জুনিয়র হাই স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখানে নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। তিনি চট্টগ্রামের বিনাজুড়ি

নবীন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি (মাধ্যমিক) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পরে চট্টগ্রামের হাটহাজারী কলেজ থেকে এইচএসসি (উচ্চ মাধ্যমিক) পাশ করেন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে স্নাতক (সন্মান)সহ স্নাতকোত্তর (এমএ) ডিগ্রী অর্জন করেন।

১৯৬৩ সালে ১৮ বৎসর বয়সে তিনি খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলাধীন বোয়ালখালী দশবল বৌদ্ধ রাজ বিহারে পরম দয়াশীল ভিক্ষু শ্রীমৎ সুমঙ্গল থেরো'র অধীনে বৌদ্ধ শ্রমণ হিসেবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। শ্রীমৎ সুমঙ্গল থেরো ছিলেন তাঁর জ্ঞাতি সম্পর্কীয় ভাই, যিনি বহু আগে প্রব্রজিত হয়েছিলেন। 'বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা'র উপ-সংঘরাজ পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাথেরো ছিলেন শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তের দীক্ষাগুরু। অর্থাৎ শ্রামণ্য জীবনের পরবর্তী অধ্যায় ভিক্ষুজীবনে তিনি তাঁকে দীক্ষিত করেছিলেন। শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে ১৯৬৬ সালের ১৬ মে চট্টগ্রামের জোবরা সুগত বিহারে উপসম্পদা (ভিক্ষু জীবন) লাভ করেন। এখানে 'বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা'র পরম পূজনীয় সংঘরাজ শ্রীমৎ শীলালংকার মহাথেরো ছিলেন তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু (উপাজ্ঝায়া)। বর্তমানে শ্রীমৎ বিমল ভিক্ষু অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের মধ্যে অন্যতম একজন, যিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা জাতিতে জন্মগ্রহণ করে শ্রদ্ধার এই উচ্চ আসনে আসীন হতে সক্ষম হয়েছেন।

যুগান্তকারী কিছু সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের স্রষ্টা এবং স্বপ্নদ্রষ্টা মোনঘর

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের তালমাতাল পরিস্থিতিতেও শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে ১৯৭৪ সালে 'মোনঘর' নামে একটি বৌদ্ধ বিহার এবং বিহার কেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর সহশিষ্য ও সহকর্মী অন্য বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ঐকান্তিক সমর্থন ও সহযোগিতায় এই অনন্য সাধারণ প্রকল্পটি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেন। তাঁর সহকর্মী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের অধিকাংশ ছিলেন একই গুরুর শিষ্য, অর্থাৎ শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তের ধর্মীয় সহোদর। তাঁরা হলেন, বর্তমান বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য সমাজ কর্মী শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ মহাথেরো, শ্রীমৎ শ্রদ্ধালঙ্কার মহাথেরো (যিনি এখনও মোনঘরে সমাজ সেবার কাজ করে যাচ্ছেন), শ্রীমৎ প্রিয় তিষ্য ভিক্ষু ও শ্রীমৎ জিনপাল ভিক্ষু। তবে শ্রীমৎ প্রিয় তিষ্য ও শ্রীমৎ জিনপাল ভিক্ষু উভয়েই সন্ন্যাস জীবন পরিত্যাগ করেছেন এবং বর্তমানে সাধারণ বৌদ্ধ হিসেবে যথাক্রমে সজ্জন চাকমা ও সুভাষ চাকমা নামে সংসারধর্ম পালন করছেন। সমাজ উন্নয়ন ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদেরও উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে জনসেবামূলক কর্মকাণ্ড ও ধর্মীয়-সামাজিক উন্নয়নে তাঁরা যে অবদান রেখেছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ অবশ্যই তা স্মরণ করবেন।

মোনঘরের মতো অনন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজটি খুব সহজসাধ্য ছিলনা। সমাজের তথাকথিত কিছু এলিট, ধনাঢ্য পরিবার ও স্বঘোষিত নেতা-নেত্রী গোছের অনেকে

সেসময় প্রবলভাবে মোনঘর প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন। সমাজের দরিদ্র ছিন্নমূল শিশুরা এখানে এসে শিক্ষালাভ করুক আর উন্নত জীবনের অধিকারী হোক সেটি তারা চাননি। এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বর্তমানে 'মোনঘর' পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি অন্যতম স্বনামধন্য ধর্মীয়-সামাজিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

মোনঘরে বহু শিশু শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছে। এসব সৌভাগ্যবান শিশুদের অনেকেই সারা পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। তারা এখন সমাজের সুশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তির অংশ এবং দেশে বিদেশে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ও কর্পোরেট সেক্টরে কর্মরত। এভাবে মোনঘর পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি পথিকৃৎ বেসরকারি সংস্থা হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মোনঘর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের কাছে বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও শব্দটি আজকের মতো এত সু-পরিচিত ছিলনা। প্রকৃতপক্ষে তখন হয়তো কেউ কল্পনাও করেননি যে এই অঞ্চলের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা একসময় বিভিন্ন এনজিওর কর্মী বা এই সেক্টরের সুবিধাভোগী হয়ে উঠবেন, যা এখন জুম্ম সমাজের বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘ

শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিমল ভিক্ষু ১৯৭৬ সালে 'পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘ' নামে আরও একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৬ সালের ১০ ডিসেম্বর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার গ্রীন রোডে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘের গঠনমূলক যাবতীয় কর্মকাণ্ডে পার্বত্য চট্টগ্রামের আপামর বৌদ্ধ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও অংশগ্রহণ তিনি নিশ্চিত করেছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে বাংলাদেশের মহা-মান্য রাষ্ট্রপতির তৎকালীন উপদেষ্টা স্বর্গীয় রাজমাতা শ্রীমতি বিনীতা রায় 'পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘ' নামটি প্রস্তাব করেন, যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিমল ভিক্ষু হলেন পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আর পরম শ্রদ্ধেয় রাজগুরু প্রয়াত শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাথেরো ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। বস্তুত এই সংগঠনটিই ছিল সেসময় নিজেদের অঞ্চলের বাইরে পার্বত্যবাসীদের একমাত্র ধর্মীয়-সামাজিক সংগঠন। পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘের সদস্যবৃন্দ টেকনাফ অঞ্চলের বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল শ্রী মংক্য মার্মার নিঃস্বার্থ অবদানের কথাও নিশ্চয় স্মরণ করবেন। তিনি সংগঠনটির দ্বিতীয় সভাপতি হিসেবে জনসেবার প্রশংসনীয় নজির স্থাপন করেছিলেন। সেসময় আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে তিনি ছিলেন একমাত্র উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তা, যিনি পাকিস্তান আর্মিতেও দক্ষতার সাথে কাজ করেছেন। ১৯৭১ সালে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর তিনি বাংলাদেশ সেনা-বাহিনীতে সিনিয়র সেনা অফিসার হিসেবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হন এবং আরও বহুদিন কৃতিত্বের সাথে দেশ সেবার পর সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহার

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহারের প্রতিষ্ঠা শ্রীমৎ বিমল ভিক্ষুর আরেকটি উল্লেখযোগ্য অবদান। এই বিহারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় ১৯৮৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি, যদিও এর এক বৎসর পর ১৯৮৪ সালে বিহারটি উদ্বোধন করা হয়। কাকতালীয়ভাবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিনটি ছিল বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম দিকপাল জ্ঞানতাপস শ্রী অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সহস্রতম জন্মবর্ষ উদযাপনের দিন। এই মহা-পুরুষের সহস্রতম জন্মবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে পৃথিবীর ২৫টি দেশ থেকে বহু গণ্যমান্য বৌদ্ধ প্রতিনিধি ঢাকায় সমবেত হয়েছিলেন। শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তের আহ্বানে বহু জ্ঞানী গুণীজনে সমৃদ্ধ এই বিশাল প্রতিনিধিদলটি সময় বের করে নিয়ে শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করেছিলেন, যা ছিল পার্বত্যবাসীদের জন্য পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তাঁদের এই অনন্য অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সাময়িকভাবে হলেও পার্বত্যবাসীদের সাথে বিশ্বের অপরাপর বৌদ্ধ দেশগুলোর জনগণের সম্পর্কের একটি ঐতিহাসিক সেতুবন্ধ রচিত হয়েছিল, যাকে উত্তরোত্তর সুদৃঢ় ও প্রসারিত করার দায়িত্ব ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে আমাদের সকলের, এবং প্রধানত সমাজের শান্তিকামী আলোকিত নেতৃবৃন্দের।

এক কথায়, এই শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহারটি পার্বত্য বৌদ্ধ সমাজের কাছে শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিমল ভিক্ষুর অতুলনীয় অবদানসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মোনঘর এবং পার্বত্য বৌদ্ধ সমাজের কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তির ঐকান্তিক সহযোগিতা ও অর্থানুকূল্যে বৌদ্ধ বিহারটিকে সফলভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী জনাব এ. জি. মামুদ ১৯৮৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহারটি উদ্বোধন করেন। পার্বত্য জনগণের সার্বিক আর্থ-সামাজিক প্রতিকূল পরিস্থিতি বিবেচনায় এই বৌদ্ধ বিহারের প্রতিষ্ঠা ছিল একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘ (World Fellowship of Buddhists) এর তৎকালীন অনারারি সেক্রেটারি জেনারেল শ্রী প্রাসার্ত রোয়াংসাকুল শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। পার্বত্য বৌদ্ধরা ঢাকায় এই জনহিতকর প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খাগড়াছড়ি থেকে নির্বাচিত তৎকালীন সংসদ সদস্য প্রয়াত জননেতা শ্রী উপেন্দ্রলাল চাকমার নিঃস্বার্থ অবদান ও সহযোগিতার কথাও কৃতজ্ঞতার সাথে নিশ্চয় স্মরণ করবেন। তিনি প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পরামর্শ এবং আর্থিক সহায়তা দিয়েও বিহার প্রতিষ্ঠার কাজটি ত্বরান্বিত করতে ভূমিকা রেখেছিলেন। প্রয়াত শ্রী উপেন্দ্রলাল চাকমা ছিলেন তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতির একজন উপদেষ্টা। এছাড়া অত্যন্ত সদ্ধর্মপ্রাণ একজন উপাসক ওভারসিয়ার ইঞ্জিনিয়ার প্রয়াত শ্রী কৃষ্ণমোহন চাকমাও শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহারের নির্মাণ কাজ তদারকিতে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন। প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনি আর্থিক সহায়তাও প্রদান করেছিলেন। তাঁর ঐকান্তিক

সহযোগিতা ও নিবিড় তদারকি ছাড়া শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহারের নির্মাণকাজ সহজে সুসম্পন্ন করা হয়তো সম্ভব হতোনা। তাঁর বিদেহী আত্মার সদগতি ও চিরশান্তিময় নির্ব্বাণ আমাদের কাম্য। এছাড়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব এবং পরবর্তীতে ভূটানে বাংলাদেশের মাননীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী শরদিন্দু শেখর চাকমা, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শ্রী দিবাকর খীসা, জাতীয় ক্রিড়াবিদ শ্রী অরুণ চাকমা এবং অন্যান্য অনেকেই এই ঐতিহাসিক শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠার কাজে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

ভারতে একটি নতুন ধর্মীয়-সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা

শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিমল ভিক্ষু বেশ কয়েকজন নিষ্ঠাবান সমাজকর্মীকে সাথে নিয়ে ভারতের কোলকাতায় ১৯৮৬ সালের ৩০ অক্টোবর শিশু করুণা সংঘ নামে আরও একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটির প্রথম সভাপতি হিসেবে পরম শ্রদ্ধেয় চাকমা রাজগুরু শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাথেরোকে নির্বাচন করা হয়। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক ও সমাজ সংস্কারকদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও জ্ঞানী ধর্ম প্রচারক, সাধক এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে কিংবদন্তীতুল্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের প্রিয়পাত্র ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ ভারত উপমহাদেশে বুদ্ধের বাণী ও শিক্ষা প্রসারে তাঁর নিষ্ঠা ও অবদানের জন্য এই অঞ্চলের বৌদ্ধদের কাছে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সত্যিকার অর্থে তিনি ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের গর্ব।

উল্লেখ্য যে, শিশু করুণা সংঘ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিনগুলোতে শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে সংস্থার কোন দাপ্তরিক পদবি গ্রহণ করেননি। সংগঠনটি পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির উপর ছেড়ে দেন। তবে সংগঠনের জন্য দেশে বিদেশে নৈতিক সমর্থন এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য সংগ্রহের কাজে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। সমাজ সেবার মহৎ কাজে নিবেদিতপ্রাণ, সৎ ও নিষ্ঠাবান কিছু কর্মী বা নেতৃত্ব গড়ে তোলাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও ছিন্নমূল শিশুদের সার্বিক উন্নয়নসহ বিপন্ন মানবতার সেবায় এগিয়ে আসার মতো নেতৃত্ব যাতে আগামী প্রজন্ম থেকে গড়ে ওঠে সে ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে সদা সচেষ্ট। তাঁর মতে, সমাজের যারা বহিঃস্থ, নিপীড়িত বা বঞ্চিতজন তাদের সার্বিক কল্যাণ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমেই একমাত্র সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জন বা উন্নত সমাজ গঠন সম্ভব।

শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিমল ভান্তের দূরদৃষ্টি, নিরলস পরিশ্রম, মেধা ও সৃজনশীল নেতৃত্বের ফলশ্রুতিতে শিশু করুণা সংঘ একটি সফল ধর্মীয়-সামাজিক উন্নয়নমূলক সংগঠন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। দীর্ঘ প্রায় তিন দশকের নানা বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে সংগঠনটি তার মূল্যবোধ নির্ভর শিক্ষা, ধর্ম ও জ্ঞানচর্চা এবং অন্যান্য নিয়মিত কর্মসূচি

নিয়ে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ ও বিকশিত হচ্ছে। প্রাক্তন এবং সদ্যপ্রয়াত মহামান্য চাকমা রাজা শ্রী ত্রিদিব রায় শিশু করুণা সংঘ পরিদর্শনে এসে দেশ বিদেশের অন্য অনেক মহান ব্যক্তিত্বের মতো সংগঠনটির ভূয়সী প্রশংসাসহ এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করেছিলেন। তিনি এবং এর প্রতিষ্ঠাতারা চেয়েছিলেন বিপন্ন মানবতার সেবা, জাতীয় সংহতি ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হোক শিশু করুণা সংঘের অন্যতম লক্ষ্য। সংগঠনটি সেই অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণের পথেই প্রতিনিয়ত অগ্রসর হচ্ছে।

বোধিচরিয় বিহার

কোলকাতা ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী বলে বিবেচিত। এই মহানগরীটি একসময় ব্রিটিশ ভারতের রাজধানীও ছিল। তাই শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে কর্তৃক বোধিচরিয় বিহার প্রতিষ্ঠার জন্যে ঐতিহাসিকভাবে প্রসিদ্ধ এবং বর্তমানেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই মহান-গরীকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও সুবিবেচনাপ্রসূত হয়েছে। বিহারটি প্রতিষ্ঠার আগে কোলকাতায় শুধুমাত্র হাতেগোনা কয়েকটি চাকমা পরিবার বসবাস করতো। সঙ্গত কারণে নিজেদের কোন বৌদ্ধ মন্দির বা কমিউনিটি সেন্টারের অভাবে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন কোলকাতার চাকমা সম্প্রদায়ের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য ও সমস্যাপূর্ণ ছিল। শিশু-কিশোররা এবং সমাজের তরুণ প্রজন্ম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে যারপরনাই বঞ্চিত হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং উদ্যোগে ১৯৮৯ সালে পবিত্র বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে কোলকাতার নি-উটাউনে বোধিচরিয় বৌদ্ধ বিহারটি উদ্বোধন করা হয়। পরবর্তীকালে বোধিচরিয় বিহার কমপ্লেক্সের মধ্যেই বোধিচরিয় স্কুল ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ করা হয়। হোস্টেলের আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় বৌদ্ধ বিহারে অনুষ্ঠিত প্রার্থনা ও বিদর্শন ভাবনায় অংশগ্রহণ করে থাকে। কোলকাতার বিভিন্ন অংশে বসবাসরত চাকমা সমাজের সদস্যগণ এখন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে সমবেত হওয়ার মধ্য দিয়ে বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠার সার্বিক সুবিধা নির্বিঘ্নে গ্রহণ করতে পারছেন। বৌদ্ধ পূর্ণিমাসহ অন্যান্য পূর্ণিমা তিথিগুলোতে, কঠিন চীবর দান এবং বিজু উপলক্ষে তারা নিজেদের সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সকলে মিলে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা সামাজিক উৎসব উদযাপন করতে পারছেন। এভাবে বোধিচরিয় বিহারটি ছাত্র-ছাত্রীসহ সমাজস্থ সকলের নৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক সংহতি সুদৃঢ়করণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বর্তমানে শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিমল ভিক্ষু শিশু করুণা সংঘের সভাপতি হিসেবে সংগঠনটির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। এর পাশাপাশি তিনি তথাগত বুদ্ধের কর্মবাদী শিক্ষা ও কল্যাণ দর্শনের আলোকে তাঁর সমাজ সেবা, শিক্ষা বিস্তার ও সদ্ধর্ম প্রচারের কাজে সর্বদা নিয়োজিত আছেন। তিনি বিদর্শন ভাবনা বা সম্যক স্মৃতি চর্চার মাধ্যমে কিভাবে শান্তিপূর্ণ

জীবন যাপন করা যায় তারও নির্দেশনা দিয়ে আসছেন। বৌদ্ধ ধর্ম এবং বিদর্শন ভাবনা বিষয়ে শিক্ষা দানের জন্য শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া এবং অন্যান্য শহরেও বহুবার আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তিনি এখনও আমেরিকায় বসবাসকারী স্বজাতির সদস্যবৃন্দ এবং ধর্মানুরাগী অন্যান্য সাধারণ মানুষের কাছে নিয়মিত বিরতিতে সদ্ধর্মের বাণী প্রচার করে যাচ্ছেন। দৈনন্দিন জীবনে বুদ্ধের মৈত্রী-করুণা এবং বিদর্শন ধ্যানচর্চার মাধ্যমে কিভাবে মানসিক শান্তি ও সামাজিক সম্প্রীতি অর্জন করা যায়, সে সম্পর্কে তিনি নিরলসভাবে তাঁর মূল্যবান দিক নির্দেশনা প্রদান করে চলেছেন।

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল প্রতিষ্ঠা

শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তের ঐকান্তিক আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় সমাজের দারিদ্র্য পীড়িত পরিবারের শিশুদের শিক্ষার জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালে কলকাতার রাজারহাটে শিশু করুণা সংঘের নামে কিছু জমি ক্রয় করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ সালে বোধিচরিয় স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন রাজারহাট ছিল একটি ক্রমবর্ধমান শহরতলী যা এখন কলকাতার সম্প্রসারিত নতুন শহর 'নিউ টাউন'-এর অন্তর্ভুক্ত। বলাবাহুল্য, নিউট-াউন এখন কোলকাতা মহানগরীর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাগ্রসর এলাকা। চাকমা রাজবংশের ৫০তম মহামান্য রাজা শ্রী ত্রিদিব রায় ১৯৯১ সালের ১৫ এপ্রিল শিশু করুণা সংঘ এবং বোধিচরিয় এডুকেশনাল কমপ্লেক্সটি পরিদর্শনে আসেন। শিশু করুণা সংঘ এবং প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং মন্তব্য করেন যে, "বোধিচরিয় আমাদের জাতীয় সংহতি সুদৃঢ়করণ ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করবে"। বোধিচরিয় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমি ছাত্র-ছাত্রীদের কয়েকজনের সাথে নিজেদের মাতৃভাষা চাকমায় কথা বলা বেশ উপভোগ করেছি। তারা খুবই অনুসন্ধিৎসু, সচেতন ও বন্ধুভাবাপন্ন।" তিনি আরও বলেন, "বোধিচরিয় স্কুলটি বিপন্ন মানবতার সেবায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখার পাশাপাশি মানুষের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক, সহাবস্থান, মৈত্রী ও সহযোগিতার বাণী ছড়িয়ে দেবে।" মহামান্য রাজা বোধিচরিয়'র মতো মানব সেবামূলক প্রকল্প এবং পরিকল্পনাধীন অন্যান্য প্রকল্পসমূহের জন্য শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তের নিরলস কর্মপ্রয়াস, তাঁর নিষ্ঠা, সততা এবং অফুরন্ত প্রাণশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

বর্তমানে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে বসবাসরত চাকমা জাতিসত্তাসহ দেশের সুবিধাবঞ্চিত ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর অন্যান্য সম্প্রদায়ের শিশুদের মাঝে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। শিশু করুণা সংঘ এসব জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সূচনা করতে সক্ষম হয়েছে। দেশের এসব সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীব-নমান উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য যে শর্ত - শিক্ষার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন, ধীরে হলেও শিশু

করুণা সংঘ সেক্ষেত্রে কাঙ্খিত ইতিবাচক অবদান রাখছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, বোধিচরিয় স্কুলে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা মাধ্যমে পড়ার সুযোগও উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। এই উভয় মাধ্যমে শিক্ষার গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলা যায়, স্মরণাতীত কাল থেকে চাকমা ও বাঙালি সম্প্রদায় সম্প্রীতির সাথে একত্রে বসবাস করে আসছে। চাকমা ও বাংলা ভাষার মধ্যে যথেষ্ট মিল থাকায় চাকমারা সহজে বাংলায় ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে। চাকমা ভাষার উৎপত্তি বহুলাংশে ঘটেছে পালি ভাষা থেকে। আর বাংলার উৎপত্তিস্থল সাধারণত ধরা হয় সংস্কৃত ও পালি ভাষাকে। ফলে ভারতবর্ষের অন্যান্য যে কোন প্রধান ভাষার চেয়ে বাংলা শেখাটা চাকমাদের জন্য সহজতর। ভাষাগত এই নৈকট্যের কারণে অনেক চাকমা ছাত্র-ছাত্রী বোধিচরিয় স্কুলে পড়তে এসে বাংলা মি-ডিয়ামকেও বেছে নিতে চায়।

যা'হোক, যুগের বাস্তবতা ও ক্রম পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা এখন চাকমাসহ অন্যান্য আদিবাসীদের জন্য একপ্রকার অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাস্তবতা হলো, ভারতবর্ষে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বর্তমানে ইংরেজি ভাষাটি মোটামুটিভাবে সাধারণ জনগণের ভাষা (লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা) হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। বিশেষ করে বাণিজ্যিক ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে। ইতিপূর্বে ইংরেজিকে অবহেলা করার কারণে এখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে ইংরেজির মাধ্যমে যোগাযোগ চাকমাদের জন্য বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বোধিচরিয় সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলটি প্রতিষ্ঠার আগে শুধুমাত্র অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল পরিবার থেকে আসা কিছু চাকমা ছাত্র-ছাত্রী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ার সুযোগ গ্রহণ করতে পারতো। বাংলাদেশ এবং ভারতের চাকমা পরিবারগুলোর ছেলেমেয়েদেরকে ব্যয়বহুল কোন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ানোর ব্যয়ভার বহন করতে পারাটা প্রায় অসম্ভব ছিল বলা চলে। ফলে দেশে বিদেশে আধুনিক বিভিন্ন সংগঠন এবং বহুজাতিক কোম্পানীতে উচ্চ বেতনের চাকুরির সুযোগ থেকে চাকমা ছেলেমেয়েরা বঞ্চিতই রয়ে গেছে। তারা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে থেকে যেতে বাধ্য হয়েছে, যেখানে আধুনিক মূল্যবোধসম্পন্ন উন্নত শিক্ষা পাওয়ার তেমন কোন সুযোগ নেই। বর্তমানে সেই অর্থে কোলকাতার বোধিচরিয় সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলটি শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় চাকমা এবং অন্যান্য সম্প্রদায়সমূহের জন্য শিক্ষার একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এখানে চাকমাসহ অন্যান্য আদিবাসীরা নিজেদের সন্তানদেরকে সহজে ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানোর সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে। এখন অধিকাংশ চাকমা পরিবার নিজেদের সন্তানদেরকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াতে আগ্রহী। তাঁরা ভারত, বাংলাদেশ কিংবা বিশ্বের যে প্রান্তেই বসবাস করুন না কেন বা যে দেশের নাগরিকই হোন না কেন।

অন্যদিকে ভারত উপমহাদেশ হলো একটি বিশাল রাষ্ট্র যা আটাশটি রাজ্য এবং সাতটি

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত। এটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র এবং জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র। একমাত্র চীনই জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতের চেয়ে একধাপ এগিয়ে আছে। বাংলাদেশ ছাড়াও চাকমা জাতির জনগণ উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রদেশে বসবাস করছেন। ভারতে মূলতঃ ত্রিপুরা, মিজোরাম, আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, দিল্লী, বোম্বে, ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতি জায়গায় তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। বিস্তৃত ভৌগলিক দূরত্বের কারণে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করা বা এক জায়গায় মিলিত হওয়া তাদের পক্ষে কঠিন একটি কাজ বটে। এক দেশে বসবাস করলেও এই ভৌগলিক দূরত্ব সামাজিক যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে তাদের জন্য বড় বাধা। শিশু করুণা সংঘ এবং এর অন্যতম প্রকল্প বোধিচরিয় এডুকেশনাল কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উল্লেখিত সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে এসেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ, ইউরোপ, আমেরিকাসহ ভারতের দূর-দূরান্ত থেকে আগত চাকমা বা অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ খুব সহজে বোধিচরিয় এডুকেশনাল কমপ্লেক্সে সন্মিলিত হতে পারেন। পরস্পরের সাথে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করা, মহানগরীর উন্নত চি-কিৎসা সেবা গ্রহণ, তীর্থযাত্রাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য তাঁরা বোধিচরিয়কে ট্রানজিট গ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহার করতে পারছেন।

সারনাথের পবিত্র বৌদ্ধ মন্দির প্রকল্প

শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিমল ভান্তে বৌদ্ধ ধর্ম এবং বুদ্ধের প্রায়োগিক শিক্ষার (দর্শনের) প্রতি পৃথিবীর মানুষের ক্রমবর্ধমান আগ্রহকে শান্তির পথে মানুষের চিরন্তন অভিযাত্রা হিসেবেই গণ্য করে থাকেন। উন্নত বিশ্বের নিঃসঙ্গ এবং ভোগবাদে অতিষ্ঠ বহু মানুষ আজ শান্তির অন্বেষণে মরিয়া হয়ে বৌদ্ধ ধর্মের দিকে ঝুঁকছে। শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে ব্যক্তিজীবনে ও বিশ্বসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ধর্মের যে অতুলনীয় ভূমিকা রয়েছে সে সম্পর্কে মানুষের শুভ উপলব্ধিকে সবসময় স্বাগত জানিয়েছেন। তবে তিনি মানুষের এই আগ্রহ ও আস্থাকে একসাথে শুভ লক্ষণ ও চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচনা করারও পক্ষপাতী। তথাগত বুদ্ধ তাঁর প্রিয়তম শিষ্য আনন্দকে একবার বলেছিলেন, বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত চারটি পবিত্র স্থান শ্রদ্ধাভরে পরিদর্শনের মাধ্যমে যে কেউ দেবলোকে প্রবেশ করতে পারে। সেই পরম পবিত্র চারটি স্থান হলো - (১) লুম্বিনী (এখানে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করেছিলেন); (২) বুদ্ধগয়া (এখানে সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন); (৩) সারনাথ (এখানে বুদ্ধ তাঁর পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের মাঝে সর্বপ্রথম ধর্মদেশনা করেছিলেন। এই স্থানটিকে বৌদ্ধ ধর্মের সুতিকাগারও বলা হয়); এবং (৪) কুশীনগর (এখানে তথাগত বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন)। বুদ্ধের অনুসারী হিসেবে জীবনে অন্ততঃ একবার হলেও এসব পবিত্র স্থান পরিদর্শনে যাওয়া উচিত। আর কিছু সময়ের জন্য নিজের এবং জগতের দুঃখ মুক্তির লক্ষ্যে সেখানে সচেতনভাবে ধ্যানমগ্ন হওয়া সদ্ধর্মপ্রাণ প্রত্যেক বৌদ্ধ নর-নারীর অবশ্য কর্তব্য। সারা পৃথিবী থেকে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ বুদ্ধের পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য

এসব পবিত্র তীর্থস্থান পরিদর্শনে আগ্রহী হন। তবে দেশ-বিদেশ থেকে আগত অনেক তীর্থযাত্রী সারনাথে সুরক্ষিত ও নিরাপদ আবাসন সুবিধার অভাবে নানা ভোগান্তির সম্মুখীন হন। তাদের এই অসুবিধা দূর করার জন্য শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে শিশু করুণা সংঘ ট্রাস্টের মাধ্যমে সারনাথে কিছু জমি কিনে সেখানে পর্যাপ্ত আবাসন সুবিধা সম্বলিত একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। তবে নিজ জনগোষ্ঠীসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তীর্থযাত্রীদের জন্য গৃহীত এই প্রকল্পের নির্মাণকাজ এখনও চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের অংশ হিসেবে শ্রদ্ধেয় বিমল ভিক্ষু ২০০১ সালে বোধি ধর্মচক্র বিহার নামে একটি বৌদ্ধ মন্দির সারনাথে প্রতিষ্ঠা করেন। বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত অন্যতম পবিত্র তীর্থভূমি এই সারনাথ ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের বারাণসীতে অবস্থিত। শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে এই সুন্দর প্রকল্পটিকেও আগামী প্রজন্মের জন্য বুদ্ধের আদর্শভিত্তিক উন্নত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের কাজে ব্যবহার করতে আগ্রহী। বৌদ্ধ শ্রমণ, ভিক্ষু এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য এখানে একটি স্কুল নির্মাণের মহৎ পরিকল্পনাও হাতে নেওয়া হয়েছে। তথাগত বুদ্ধ প্রবর্তিত পঞ্চশীলের ভিত্তিতে নৈতিক চরিত্র গঠনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। এর ফলে পর্যায়ক্রমে বৌদ্ধ ধর্মের নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধে ঋদ্ধ হয়ে নতুন প্রজন্ম সৎ চরিত্রগুণ সম্পন্ন ও ন্যায়পরায়ণ মানুষ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে সমাজের শান্তি ও কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবে বলে শ্রদ্ধেয় ভান্তে স্বপ্ন দেখেন। এই নতুন প্রজন্ম একটি শান্তি ও সম্প্রীতিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে তিনি মনে করেন। শ্রদ্ধেয় বিমল ভিক্ষু বিশ্বাস করেন যে, সারনাথের স্কুলে বুদ্ধের নৈতিক শিক্ষায় বলীয়ান হয়ে গড়ে ওঠা ছাত্র-ছাত্রীরা একদিন একটি ন্যায্য, সুখী-সমৃদ্ধিশালী সমাজ বিনির্মাণের পাশাপাশি জাতীয় সংহতি এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায়ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

শাক্য মৈত্রী বৌদ্ধ বিহার

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সান বার্নারডিনো'তে ২০০৯ সালে 'শাক্য মৈত্রী বৌদ্ধ বিহার' প্রতিষ্ঠায় শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেন। এর ফলে স্থানীয় জনগণের জন্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনসহ ধ্যান চর্চার সুযোগ সেখানে সৃষ্টি হয়েছে। আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুরু হিসেবে শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে এই বৌদ্ধ মন্দিরে স্থানীয় অনুসারীদের জন্য নিয়মিতভাবে বিদর্শন ধ্যানের প্রশিক্ষণ ও ধর্মোপদেশ দিয়ে আসছেন। বর্তমানে আমেরিকার লস এঞ্জেলসের আশপাশের এলাকা থেকেও অনেকে এই মন্দিরে এসে আধ্যাত্মিক জ্ঞানচর্চা এবং অন্যান্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে নিয়মিতভাবে অংশ নিচ্ছেন। এভাবে মানসিক প্রশান্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের মাঝে মৈত্রী ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ়করণে শাক্য মৈত্রী বৌদ্ধ বিহারটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

সমাজ উন্নয়ন এবং মানবিক সহায়তা বিষয়ক কার্যক্রম কোন দায়িত্বই তাঁর কাছে বেশি দায়িত্ব নয়

১৯৭৫ সালে শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তেকে খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলার বোয়ালখালীতে

স্থাপিত পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রমের প্রেসিডেন্টের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই আশ্রমটি মূলতঃ ১৯৬১ সালে সদ্ধর্ম জ্যোতিকাধ্বজা, অগ্রমহাপণ্ডিত, সদ্ধর্মাদিত্য পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাথেরো কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধ অনাথ আশ্রমের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে ঐ বৎসর একই এলাকায় অবস্থিত ধর্মোদয় পালি কলেজের সভাপতিও নির্বাচিত হন।

পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিমল ভিক্ষুকে ১৯৮৫ সালে যুগপৎ তিনটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের একটি ছিল ঢাকায় পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘ এবং অন্য দু'টি পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত মোনঘর (রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত একটি অনাথাশ্রমসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) ও পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম (খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলার বোয়ালখালীতে অবস্থিত)। বলাবাহুল্য, আশ্রম দু'টি রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলাতে অনেক আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেসময় তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার কার্যক্রমসহ তাঁর ধর্মীয়-সামাজিক এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছিলেন।

ত্রিপুরায় আশ্রিত শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহায়তা

১৯৮৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ ব্যাপক মাত্রায় রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতার শিকার হন। বাংলাদেশে জাতিগত নির্মূলীকরণ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়ে কমপক্ষে ৬০,০০০ পাহাড়ি মানুষ শরণার্থী হিসেবে সীমানা অতিক্রম করে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। ঐসময় পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ছিল সত্যিই ভয়াবহ, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে পরিপূর্ণ। পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রমের অসহায় শিশুদেরকেও আক্রমণের হাত থেকে রেহাই দেওয়া হয়নি। বাংলাদেশ নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তায় কিছু মৌলবাদী মুসলিম বৌদ্ধ অনাথাশ্রমটি আক্রমণ করে। ঐ পরিস্থিতিতে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করা ছাড়া শিশুদের জন্য অন্য কোন বিকল্প পথ খোলা ছিলনা। ফলে এই অনাথ শিশুরাও অবশেষে শরণার্থী হিসেবে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে ত্রিপুরার শরণার্থী শিবিরে ছুটে যান এবং শরণার্থীদের মানবেতর জীবন দেখে তাদের জন্য ত্রাণসামগ্রী বিতরণের ব্যবস্থা করেন। তিনি শুধু আশ্রমের অনাথ শিশুদের জন্য নয় বরং শরণার্থী শিবিরের সকলের জন্য সাধ্যমত ত্রাণের ব্যবস্থা করেন। ঐসময় শরণার্থীদেরকে দক্ষিণ ত্রিপুরার তাকুমবাড়ি, করবুক, পঞ্চরাম পাড়া, শিলাছড়ি, কাঠালছড়ি ও লেবাছড়া এই ছয়টি শিবিরে রাখা হয়েছিল। শ্রদ্ধেয় ভান্তে শরণার্থীদের দুর্দশা লাঘবের জন্য নিরলস পরিশ্রম করেন। তিনি পোশাক-পরিচ্ছদ, ঔষধপত্র, কম্বল প্রভৃতি ত্রাণসামগ্রী বিতরণের পাশাপাশি তাদের শিশুদের শিক্ষার জন্য ২০টি অস্থায়ী স্কুল স্থাপন করেন। এসব স্কুলের মধ্যে ১৫টি প্রাইমারি স্কুল এবং বাকি ৫টি সেকেন্ডারি স্কুল

ছিল। তিনি এসব স্কুল পরিচালনায় সহযোগিতার জন্য শরণার্থীদেরকে সংগঠিত করেন। শিশুদের পড়াশুনো চালিয়ে যেতে যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য তিনি শিক্ষকদের বেতনসহ আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র এবং প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা প্রদান করেন।

লাঞ্ছিত মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে তিনি শুধু ত্রাণসামগ্রী বিতরণের মধ্যেই নিজের দায়িত্ব শেষ করেননি। শরণার্থীদের অমানবিক জীবন ও দুর্দশার প্রতি ক্ষমতাধর রাষ্ট্র ও সরকারগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যও তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন। সেসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি শরণার্থীদেরকে যথাযথ মর্যাদার সাথে স্বভূমিতে পুনর্বাসনসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও মানবাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

৭২ জন অনাথ শিশুর ফরাসি দেশে যাত্রা

পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস ও জনগণের জীবনে এবং শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তের নিজের জীবনেও ১৯৮৭ সালের ৩০ অক্টোবর একটি ঐতিহাসিক দিন। এই দিনে তাঁরই উদ্যোগে ত্রিপুরার শরণার্থী শিবিরে আশ্রিত ৭২ জন অনাথ শিশু উন্নত জীবন ও শিক্ষা লাভের জন্য ভারতবর্ষ ছেড়ে ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে উড়াল দেয়। ফ্রান্সভিত্তিক একটি জনকল্যাণমূলক সংস্থা পারতাজ-এর সহায়তায় সেদেশে তাদের পড়াশুনা ও থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। এই অনাথ শিশুরা পার্বত্য চট্টগ্রামের দীঘিনালা উপজেলায় অবস্থিত পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথাশ্রমের ছাত্র ছিল। ফ্রান্সে অনাথ শিশুদের জন্য শিক্ষাসহ উন্নত জীবনের ব্যবস্থা করায় শ্রদ্ধেয় ভান্তেকে শিশু পাচারকারীর অপবাদও শুনতে হয়েছে। যদিও পরবর্তীতে সত্য স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছিল, সহজাত নিয়মেই। বড় হয়ে ৭২ জন শিশুর প্রায় সকলে এখন ফ্রান্সে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বিশ্বের উন্নত একটি দেশের গর্বিত নাগরিক। বর্তমানে তারা পরিপূর্ণ মানবিক মর্যাদা ও স্বাধীনতা নিয়ে সেদেশের অন্য নাগরিকদের মতো সকলের সাথে মিলেমিশে শান্তি ও সম্প্রীতিপূর্ণ জীবন যাপন করছেন। তারা এখন পরিপূর্ণ মানুষ এবং তাদের অনেকে বাংলাদেশে নিজেদের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে আত্মিক-বৈষয়িক সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি ফ্রান্সে নিজস্ব পরিবারও গড়ে তুলেছেন। এই শিশুদের জীবনে অর্জিত সাফল্য ও সহযোগিতার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের পরিবারসহ আত্মীয় স্বজনদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন এখন দৃশ্যমান। ভারতের শরণার্থী শিবিরে পড়ে থাকলে যা কখনই সম্ভব হতোনা।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হলো, ফ্রান্সে বসবাসরত এই ৭২ জন তরুণ এবং অন্যান্য চাকমা পরিবারগুলোর আন্তরিক প্রচেষ্টায় এবং ফরাসি জনগণের ঐকান্তিক সহযোগিতায় সেদেশে দু'টি অলাভজনক ও মানব সেবামূলক সংগঠন (এনজিও) প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে, যা প্রশংসার দাবি রাখে। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা বিস্তার এবং সামাজিক উন্নয়নে কাজ করার জন্য সংগঠন দু'টি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর একটির নাম 'আহ্ঝা ইন্টারন্যাশনাল' যা উত্তর ফ্রান্সের ল্য মনস্ শহরে অবস্থিত। দ্বিতীয়টি দক্ষিণ ফ্রান্সভিত্তিক

সংগঠন, যার নাম 'ফ্রেন্ডস অব জুম্ম'। এই সংগঠনগুলোর মাধ্যমে ফ্রান্সে বসবাসরত চাকমারা নিজেদের মধ্যে সংহতি ধরে রাখার পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলোর সু-বিধাবঞ্চিত মানুষকে সাধ্যমতো আর্থিক সহায়তাও দিয়ে যাচ্ছেন। এভাবে তারা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে তারা আসলে বাংলাদেশের মানুষের জন্যও সৌভাগ্যের চাবিকাঠি হতে পারেন এবং জন্মভূমির মানুষ তাদের জন্য, তাদের মহৎ কাজগুলোর জন্য গর্ব অনুভব করতে পারে। গর্বের বিষয় হলো, ফ্রান্সের চাকমারা নিজেদের শেকড়কে, নিজেদের সংস্কৃতি, সমাজ ও মাতৃভূমি বাংলাদেশকে কখনও ভুলে যাননি। ফ্রান্সের মতো দেশে ব্যস্ত নাগরিক জীবনের মাঝেও তাঁরা নিজেদের চিরাচরিত ধর্ম, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির চর্চা যথারীতি অব্যাহত রেখেছেন।

তবে একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য। প্রথম দিকে এই ৭২ জন শিশুর ফ্রান্সে পাড়ি জমানো নিয়ে নানা অস্বস্তিকর কল্পকাহিনী ও অভিযোগ উত্থাপিত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে এমন অনেক বিবেকবান মানুষ ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী রয়েছেন যাঁরা যথাযথ অনুসন্ধান ছাড়া এসব কাহিনীকে বিশ্বাস করেননি। বুদ্ধের শিক্ষায় আস্থা থাকলে কেউ গোঁড়ামিপূর্ণ আচরণ বা কোন কিছুতে অন্ধভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না। ত্রিপিটকের অঙ্গুত্তর নিকায়ের কালাম সূত্রে বুদ্ধ ভালো-মন্দ সম্পর্কে স্বাধীনভাবে নিজের সর্বোচ্চ বিবেচনাবোধকে কাজে লাগিয়ে দৈনন্দিন জীবনে ভালোটিকে বেছে নেওয়ার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, শুধুমাত্র শোনা কথায়, রটনায়, ধর্মগ্রন্থের লেখায়, কোন চিন্তাধারায়, সম্ভাব্যতায় কিংবা শিক্ষক, গুরুজন এবং নেতারা বলেছেন বলে কোন কিছুতে নির্বিচারে বিশ্বাস স্থাপন করা যাবে না। আদ্যোপান্ত বিচার বিশ্লেষণের পর যদি কারও কাছে বিষয়টি নিন্দামুক্ত, জ্ঞানীদের দ্বারা প্রশংসিত এবং ব্যাপকার্থে জীব-জগতের জন্য হিতকর ও শান্তিদায়ক বলে প্রতীয়মান হয় একমাত্র তখনই তাকে সত্য ও বাস্তবসম্মত বলে গ্রহণ করা বাঞ্চনীয়। ৭২ জন আদিবাসী শিশুর ফ্রান্সে অভিবাসিত হওয়ার বিষয়টিও পার্বত্য চট্টগ্রামের জ্ঞানীজনেরা সেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ সেসময় জুম্মদের প্রধান রাজনৈতিক দল, রাষ্ট্রযন্ত্র ও একশ্রেণির মিডিয়া ৭২ জন শিশুর বিদেশ গমন এবং শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তের বিরুদ্ধে বিস্তর নেতিবাচক প্রচারণা চালালেও অধিকাংশ মানুষ তা বিশ্বাস করেননি। আসলে বাইরের জগৎ সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকায় কিছু মানুষ অপপ্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। এখনতো পুরো পৃথিবী বাংলাদেশের আদিবাসীদের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে বলা যায়। তাঁদের অনেকে আজ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সভা সেমিনারে অংশগ্রহণ কিংবা আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা করার জন্য বহির্বিশ্বে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করছেন। দেশের বাইরে না গেলে বহির্বিশ্ব সম্পর্কে সঠিক ও বাস্তবসম্মত ধারণা পাওয়া বেশ কঠিনই বটে। ঐসময় দেশের বাইরে যাওয়ার সুযোগ পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের তেমন ছিল না। ফলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তথা উন্নত দেশের নাগরিকগণ কিভাবে পূর্ণ মানবিক মর্যাদা ও স্বাধীনতা নিয়ে সকলের সাথে

মিলেমিশে শান্তি ও সম্প্রীতিপূর্ণ জীবন যাপন করে, সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া রাজনৈতিক সহিংসতার সেই দিনগুলোতে একপ্রকার অসম্ভবই ছিল বলা চলে।

বর্তমানে, বলা যায় নিয়তির অদ্ভুত খেয়ালে পূর্ববর্তী প্রজন্মের চিন্তার ঠিক বিপরীতে আধু-নিক প্রজন্মের পিতা-মাতারা তাদের সন্তানদের উন্নত জীবন ও আধুনিক শিক্ষা নিশ্চিত করার প্রত্যয়ে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে হয় নিজেরা অভিবাসিত হচ্ছেন অথবা সন্তানদেরকে সেখানে পাড়ি জমাতে উৎসাহিত করছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের সংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক বাস্তবতাও এর একটি অন্যতম কারণ। মূলতঃ মানবিক মর্যাদা ও স্বাধীনতা নিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ সমৃদ্ধ জীবনের সন্ধানে তৃতীয় বিশ্বের বহু মানুষের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক মানুষও আজ ইউরোপ আমেরিকামুখী। এভাবে বিগত প্রায় দুই দশক ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের নতুন প্রজন্মের অনেকে উন্নততর শিক্ষা ও জীবিকার সন্ধানে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন। সেখানে তারা নতুন দেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও উন্নত জীবনমানের সান্নিধ্যে আসছেন। পরবর্তীতে তাদের অনেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করে উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকারী হচ্ছেন। তবে অপ্রিয় সত্য হলো, বিদেশগামী এসব অধিকাংশ আদিবাসী মানুষের মাঝে বিশ্বমুখী হওয়ার প্রেরণা একসময়ের ৭২ জন অনাথ শিশুর অচেনা জগতে পাড়ি জমানোর সাহস থেকেই জ্ঞাতসারে বা নিজেদের অজান্তে সঞ্চারিত হয়েছে বলা যেতে পারে। কারণ তারা সেই ১৯৮৭ সালেই নতুন এক জগতের উদ্দেশ্যে তাদের দুঃসাহসী অভিযাত্রায় শামিল হয়েছিল। বিদেশভীতি ভাঙার ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে তারাই ছিল বাংলাদেশ ও ভারতের পাহাড়ি আদিবাসীদের পথিকৃৎ। বলাবাহুল্য, এই ৭২ জন শিশু ফরাসি দেশে অভিবাসিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ভারত, বাংলাদেশ ও মিয়ানমার ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশে হাতেগোনা মাত্র কয়েকটি চাকমা পরিবার পূর্বে থেকে বসবাস করে আসছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তির জন্য প্রার্থনা সভা

পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার এক বৎসর পরে ১৯৯৮ সালে শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে রাঙ্গামাটি পরিদর্শনে আসেন। সেসময় বিদেশী অন্যান্য সন্মানিত অতিথি ছাড়াও তাঁর সাথে এসেছিলেন আয়ারল্যাণ্ডের প্রখ্যাত মানবাধিকার কর্মী নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মিজ্ ম্যাইরেড কোরিগ্যান ম্যাগুয়্যার এবং ফ্রান্সের স্বনামধন্য মানবতাবাদী ও শান্তিকামী উন্নয়ন প্রবক্তা মিস্টার পিয়ের মার্চান্ড। এই সফরে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভবিষ্যত এবং উন্নয়ন সম্ভাবনা নিয়েও তাঁরা কথা বলেন এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ তুলে ধরেন। শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে রাঙ্গামাটি পৌঁছে শহরের অন্যতম পুরনো বৌদ্ধ মন্দির আনন্দ বিহারের ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ মহাথেরোকে পার্বত্য জনগণের শান্তি ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য একটি ধর্মীয় প্রার্থনা সভা আয়োজনের অনুরোধ জানান। বিগত দুই দশক ধরে চলা রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও জাতিগত সহিংসতায় পাহাড়ে যে পরিমাণ রক্তপাত

ঘটেছিল তাতে শ্রদ্ধেয় ভান্তে অত্যন্ত বিচলিত ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন পাহাড়ে রক্তপাত চিরতরে বন্ধ হোক। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, বুদ্ধের সাম্য, মৈত্রী, করুণা ও মানব প্রেমের আদর্শ ও মূল্যবোধ মানুষের মনে জাগ্রত করা গেলে পার্বত্য চট্টগ্রামে চিরস্থায়ী শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপন সম্ভব হবে। এই কাঙ্খিত শান্তির জন্য শ্রদ্ধেয় ভান্তের ঐকান্তিক আগ্রহ ও অনুপ্রেরণায় ১৯৯৮ সালের ২০ নভেম্বর সন্ধ্যায় আনন্দ বিহারে একটি সমবেত প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাঙ্গামাটির সর্বস্তরের জনগণ এবং নোবেল শান্তি পুরস্কার জয়ী মিজ্ ম্যাইরেড কোরিগ্যান ম্যাগুয়্যার এবং মিস্টার পিয়ের মার্চান্ডসহ অন্যান্য বিদেশি অতিথিরাও এতে অংশ নেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশে স্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে 'শান্তি চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের একান্ত প্রত্যাশা ছিল শান্তিচুক্তির সাথে সাথে পাহাড়ে রক্তপাতের অধ্যায়েরও চিরসমাপ্তি ঘটবে। জনগণের প্রত্যাশার সাথে সংগতি রেখে শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তেও ১৯৯৮ সালের ২০ নভেম্বর রাঙ্গামাটির আনন্দ বিহারে আয়োজিত প্রার্থনা সভার মধ্য দিয়ে তাঁর মানবাধিকার বিষয়ক কর্মকাণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন।

যুগান্তকারী বিভিন্ন কনফারেন্স ও কনভেনশানে শান্তির প্রতিনিধি ও প্রবক্তা

রাঙ্গামাটিতে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সন্মেলন

শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে ১৯৮৩ সালে রাঙ্গামাটির আনন্দ বিহারে একটি আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সন্মেলনের আয়োজন করেন। তথাগত বুদ্ধের প্রদর্শিত পথে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানবাধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে এই সন্মেলনের আয়োজন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, সমাজকর্মী এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সাবেক উপদেষ্টা শ্রী সুবিমল দেওয়ান এই আন্তর্জাতিক সন্মেলনের সমন্বয়ক ছিলেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় ও পরিশ্রমে সন্মেলনটি অত্যন্ত সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। রাঙ্গামাটির আনন্দ বিহারে অনুষ্ঠিত এই সন্মেলনটি নিঃসন্দেহে পার্বত্য জনগণের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিত ও শান্তিকামী নেতৃবৃন্দ এই সন্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধের অপার করুণা ও অহিংসার বাণী সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি ও কল্যাণের পক্ষে কাজ করতে তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন। পৃথিবীর ২০টি দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিরা অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে এই সম্মেলনে অংশ নেন।

জাতিসংঘের মানবাধিকার সন্মেলন

১৯৮৭ সালের ৩-৭ আগস্ট সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত পাঁচ দিনের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সন্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিমল ভিক্ষুকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। জাতিসংঘের ইকোনমিক এণ্ড সোশ্যাল কাউন্সিল, কমিশন অন ইউম্যান রাইটস, সাব-কমিশন অন প্রিভেনশন অব ডিসক্রিমিনেশন এণ্ড প্রোটেকশন অব মাইনোরিটিজ এই সম্মেলনটি আয়োজন করে।

যে কোন কারণেই হোক, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজিত রাজনৈতিক সংঘাত ও অস্থিরতার ঐ দিনগুলোতে পাহাড়ি নেতৃবৃন্দসহ আদিবাসী জনগণ 'মানবাধিকার' শব্দটি দ্বারা কিছুটা হলেও বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। সেসময় অনেকের কাছে 'রাজনীতি' ও 'মানবাধিকার' শব্দ দু'টি সমার্থক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বাস্তবে রাজনীতির উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল ও দেশ শাসন করা। আর অন্যদিকে মানবাধিকার বলতে বোঝায় জনগণের মৌলিক মানবিক অধিকার যেগুলো একটি নিরুদ্বেগ শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য অপরিহার্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে একজন অন্যতম পথিকৃৎ সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি পার্বত্য জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে ১৯৮০ সাল থেকে মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাঁর পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সংগঠনের সহযোগিতায় কিংবা যৌথভাবে তিনি তাঁর মানবাধিকার কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করেছিলেন। সহায়তা দানকারী সংগঠনসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অবস্থিত এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, এন্টি-স্লেভারি সোসাইটি এবং সারভাইবাল ইন্টারন্যাশনাল; আমস্টারডামে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ফেলোশিপ অব রিকনসিলিয়েশন এবং ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ক গ্রুপ অন ইণ্ডিজেনাস এ্যাফেয়ার্স। এছাড়া ছিল নিউইয়র্কভিত্তিক হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, থাইল্যান্ডের ব্যাংককভিত্তিক সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক অব এনগেইজড বুড্ডিস্টস; ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলেতে অবস্থিত বুড্ডিস্ট পিস ফেলোশিপসহ অন্যান্য অনেক সংগঠন। বিভিন্ন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তৃতা করার জন্য শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে এসব সংগঠন কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এই সংগঠনগুলো তাদের বিভিন্ন মিডিয়া বা প্রকাশনার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ করাসহ বাংলাদেশ সরকারের উপর আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগ এবং জুম্মদের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনে প্রভূত অবদান রেখেছিল। এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডের সাথে ব্যাপকভাবে পরিচিত এবং 'মানবাধিকার' শব্দের অর্থও তাদের কাছে সুস্পষ্ট, যা আশির দশকের বাস্তবতায় একটু ধোঁয়াশাপূর্ণই ছিল। বর্তমানে প্রতি বছরের মে মাসে বাংলাদেশের সমতল এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আদিবাসী প্রতিনিধিরা নিউইয়র্কের জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আদিবাসী বিষয়ক সন্মেলনে যোগদান করে থাকেন। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশে মানবাধিকার ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠাই তাঁদের এই অংশগ্রহণের লক্ষ্য। আজ থেকে প্রায় তিন দশক আগে শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে ঠিক সে কাজটিই করেছিলেন।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে অংশগ্রহণ

এযাবৎ তিনিই ছিলেন বিশ্বের একমাত্র থেরবাদী বৌদ্ধ ভিক্ষু

পরম শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে ১৯৯২ সালের ১০ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এশিয়ার আদিবাসীদের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। আন্তর্জাতিক

আদিবাসী বর্ষ উপলক্ষে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি তাঁর বক্তৃতায় এশিয়ার আদিবাসীদের বহুমাত্রিক সমস্যার চিত্র তুলে ধরেন এবং সেগুলো নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। জাতিসংঘের ইতিহাসে শ্রদ্ধেয় বিমল ভিক্ষুই একমাত্র থেরবাদী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী যিনি সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করে তথাগত বুদ্ধ প্রদর্শিত সাম্য-মৈত্রী-করুণার আদর্শে বিশ্বের আদিবাসীদের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন।

বিশ্ব চাকমা সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কোলকাতায় অবস্থিত বোধিচরিয় এডুকেশনাল কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তের উদ্যোগে ১৯৯৩ সালের ১২-১৫ এপ্রিল প্রথমবারের মতো বিশ্ব চাকমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তিনি ঐ সম্মেলনে মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেন। আর্জেন্টিনায় ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত শ্রী মুকুর কান্তি খীসা কোলকাতায় অবস্থিত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মিউজিয়ামের অডিটোরিয়ামে সম্মেলনটির উদ্বোধন করেন। মাননীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী খীসা চাকমা সমাজের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বদের মধ্যে অন্যতম একজন। পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার খবংপুজ্যা গ্রামে তিনি জন্মেছিলেন। এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে 'ওয়ার্ল্ড চাকমা অর্গানাইজেশন' নামে চাকমাদের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। চাকমা জাতির ইতিহাসে এটিই তাদের প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং একটি সাহসী বৈশ্বিক উদ্যোগ। বর্তমানে এই সংগঠনটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসরত চাকমাদের মধ্যে কার্যকর নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। তথাগত বুদ্ধের সাম্য, মৈত্রী, করুণা, সৌভ্রাতৃত্ব এবং ক্ষমার শিক্ষা ও মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত এই সংগঠনটি সারা বিশ্বে একটি শক্তিশালী, সুশিক্ষিত, টেকসই এবং জ্ঞাননির্ভর চাকমা সমাজ ও জাতি বিনির্মাণে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সদ্ধর্মের বাণী প্রচার : নানা দেশে, মহাদেশে

শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে মানবাধিকার আন্দোলনের একজন পথিকৃৎ হিসেবে শান্তির বাণী প্রচারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। বিশ্ব সম্প্রদায়ের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মানবাধিকার সংরক্ষণের দাবিসহ বুদ্ধের সাম্য ও অহিংসার বাণী প্রচারে তিনি বহু দেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন। ভ্রমণকৃত দেশগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, হন্ডুরাস, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ডস, স্পেন, সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে, জার্মানী, ইতালি, চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকা, নেপাল, ভূটান প্রভৃতি।

জাপানের সাথে সম্পর্ক

১৯৯৭ সালের পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগে বাংলাদেশ সরকার এবং রাজনৈতিক নানা মহল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে অতিরঞ্জিত বিভিন্ন প্রোপাগান্ডা

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপকভাবে চালানো হচ্ছিল। এসব প্রচারণায় মনে হচ্ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে যেন চিরস্থায়ী শান্তি বিরাজ করছে এবং আদিবাসী জনগণের উপর চালানো মানবাধিকার লঙ্ঘনের সব কর্মকাণ্ড যেন চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। বলা হচ্ছিল, বাংলাদেশ সরকার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার আওতায় পাহাড়ি আদিবাসীদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল অধিকার লিখিতভাবে মঞ্জুর করেছে, যা পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটি জেলা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে। আসলে সেটি ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর একটি প্রচারণা। কারণ বাস্তবতা ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। বাস্তবে ঐসব জেলা পরিষদের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশের সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বহাল ছিল। আর পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনও যথারীতি চলছিল। জাতীয় পর্যায় থেকে সুপরিকল্পিত ও দেশে-বিদেশে প্রচারিত এসব মিথ্যাচার ও দ্বিচারিতার কারণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও বিভ্রান্ত হচ্ছিল। এই প্রেক্ষাপটে বাস্তব সত্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য 'ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক অব এনগেইজড বুড্ডিস্টস-জাপান' (সংক্ষেপে ইনেব-জাপান) ১৯৮৯ সালে শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে এবং বর্তমান লেখক (প্রফেসর প্রজ্ঞাজ্যোতি চাকমা/তালুকদার)কে জাপান ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানায়। উল্লেখ্য, প্রফেসর শ্রী প্রজ্ঞাজ্যোতি চাকমা শ্রীমৎ বিমল ভিক্ষুর দীর্ঘদিনের একজন বন্ধু, সহকর্মী, সমর্থক এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা। বৌদ্ধ ধর্মের সাম্য-মৈত্রী-করুণা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার হরণের বাস্তবতা সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তাঁরা একসাথে জাপানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেসময় ইনেব-জাপান এর প্রধান ছিলেন রেভারেন্ড মারুয়ামা। আর তাঁকে সহযোগিতা করতেন রেভারেন্ড রিয়োকো ইয়ামাদা, রেভারেন্ড সুজুকি এবং জাপানী বৌদ্ধদের মধ্যে অন্যান্য সন্মানীত সদস্যবৃন্দ। শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে বুদ্ধের মানবতাবাদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও মানবাধিকার বিষয়ে জাপানের অন্ততঃ ১৬টি শহরে অত্যন্ত সফলভাবে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন। এসব শহরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো টোকিও, ওসাকা, কিয়োটো, নাগোয়া, হিরোশিমা, ফুকুওকা প্রভৃতি। এছাড়া অন্যান্য সভা সমাবেশে যোগদানের পাশাপাশি শ্রদ্ধেয় ভান্তে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং পার্লামেন্ট হাউজ (ডায়েট) এ কয়েকটি সাক্ষাৎকার ও সংবাদ সম্মেলনেও অংশ নেন। জাপানের দি আসাহি শিমবুন, মাইনিচি শিমবুন, দি জাপান টাইমস এর মতো জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ব্যাপক গুরুত্বের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতিসহ তাঁদের এই সফরের সংবাদ প্রচারিত হয়। এনএইচকে, জাপানের জাতীয় টেলিভিশন শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তের নেতৃত্বে এবং প্রফেসর শ্রী পি. জে. চাকমাকে সাথে নিয়ে পরিচালিত এই শান্তি মিশনের খবর গুরুত্বের সাথে সম্প্রচার করে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো জাপানেও একইভাবে শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে মিডিয়ার অভূতপূর্ব সাড়াসহ পার্বত্য আদিবাসীদের পক্ষে ব্যাপক জনমত গঠনে সক্ষম হন। জাপানে অবস্থিত অন্যান্য বিদেশি মিডিয়ার বদৌলতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও তাঁদের এই শান্তি মিশনের খবর প্রচারিত

হয়, যা পার্বত্য চট্টগ্রামের নাজুক মানবাধিকার পরিস্থিতির দিকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে কমবেশি অবদান রেখেছে।

বিশ্বশান্তির জন্য প্রয়াস

নিউইয়র্কের জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ২০০০ সালের ২৮-৩১ আগস্ট অনুষ্ঠিত বিশ্বের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতাদের সহস্রাব্দ বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে (Millennium World Peace Summit) শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে একজন বৌদ্ধ প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নেন। তিনি তাঁর ভাষণে বিশ্ব নেতাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, যদি বিশ্বের জনগণ বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম নীতিমালা 'পঞ্চশীল' মনেপ্রাণে অনুসরণ করেন এবং চারটি পরম সত্যে (চতুরার্য সত্য) বিশ্বাস রেখে সমস্যা সমাধানে ব্রতী হন তাহলেই একমাত্র বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব, যে উপদেশ তথাগত বুদ্ধ আড়াই হাজার বৎসর আগে পৃথিবীর মানুষকে দিয়ে গেছেন।

জাতিসংঘে বৈশাখী পূর্ণিমা উদযাপন

নিউইয়র্কের জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আয়োজিত পবিত্র বৈশাখী বা বুদ্ধ পূর্ণিমা (Vesak Day) উদযাপনের জন্য পরম শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তেকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। ২০০৯ সালের ১৫ মে জাতিসংঘ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি ছিল বিশ্বের বৌদ্ধদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের ও সাফল্যমণ্ডিত একটি দিন। কারণ সেদিনই বৈশাখী পূর্ণিমাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়। জাতিসংঘে দক্ষিণ কোরিয়ার স্থায়ী মিশন এই সাফল্যের দাবিদার। কারণ তারাই বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সংগঠনগুলোর সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এই সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে একজন বৌদ্ধ প্রতিনিধি হিসেবে জাতিসংঘে এই পবিত্র দিবসটি উদযাপনে অংশ নেন এবং বিশ্বশান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য আয়োজিত প্রার্থনা সভা ও মঙ্গলসুত্র পাঠে অংশগ্রহণ করেন। জাতিসংঘের সন্মানিত মহাসচিব মি. বান কি মুন পবিত্র দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে তাঁর ভাষণে তথাগত বুদ্ধের মানবতাবাদী দর্শন ও শিক্ষাকে স্মরণ করে বলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কেউ দুঃখ ভারাক্রান্ত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কেউ সুখী হতে পারিনা। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ আজ বুদ্ধের শান্তিবাদী জীবন দর্শন ও শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত।" ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বৌদ্ধ প্রতিনিধি এবং অন্যান্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিষয়ে আলোচনা করেন এবং পার্বত্য জনগণের দুঃখ-দুর্দশা নিরসনে তাঁদের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করেন।

জীবনের অনুপ্রেরণা, শিক্ষক এবং আত্মার আত্মীয়
পরম শ্রদ্ধেয় সদ্ধর্মাদিত্য শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাথেরো

শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিমল ভিক্ষু তাঁর শিক্ষা জীবনের প্রথম দিকে একজন মহান মানবতাবাদী সাধক ও সমাজ সংস্কারকের সংস্পর্শে আসেন এবং জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও ব্রত কী

হওয়া উচিত সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন। তিনি আর কেউ নন, তাঁরই গুরু ভান্তে পরম শ্রদ্ধেয় সদ্ধর্মাদিত্য ভদন্ত শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাথেরো। তিনি ছিলেন সদ্ধর্ম, সমাজ সেবা ও মানব কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ একজন বৌদ্ধ সাধক। চিন্তায় মননে আধুনিক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, উদার ও মানবতাবাদী এই শান্তির দূত চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছিলেন। শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাথেরো ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজ সংস্কারকও। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্ম এবং আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধ ধর্ম ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অতুলনীয় অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কারণ সে সময়ের পার্বত্য সমাজে থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের সঠিক চর্চা এবং আধুনিক শিক্ষার আলো নানা আর্থ-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কারণে খুব বেশি প্রসারিত হতে পারেনি। পার্বত্য জনসমাজে ধর্মের আধুনিক চর্চা ও শিক্ষা বিস্তারে অভূতপূর্ব অবদানের জন্য পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাথেরো পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে সর্বকালের শ্রদ্ধেয় বৌদ্ধ মনীষীদের মধ্যে অন্যতম একজন হয়ে থাকবেন। স্বাভাবিকভাবে পার্বত্য জনগণ বৌদ্ধ ধর্ম ও বিহার কেন্দ্রিক আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে এই পরম শ্রদ্ধেয় মনীষীর অমূল্য অবদানকে আজীবন স্মরণ ও লালন করবেন।

পরম শ্রদ্ধেয় জ্ঞানশ্রী মহাথেরো ১৯৬০ সালে মহালছড়ি উপজেলার মুবাছড়ি গ্রাম থেকে দীঘিনালা উপজেলাধীন বোয়ালখালি দশবল বৌদ্ধ রাজবিহারে চলে আসেন। তিনি মুবাছড়ি বৌদ্ধবিহারে এসেছিলেন ১৯৫৭ সালে, পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার মাইচছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের তৎকালীন চেয়ারম্যান বর্তমানে প্রয়াত শ্রী বিন্দু কুমার চাকমার সানুগ্রহ আমন্ত্রণে। ১৯৫৭ সালে যখন তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে পদার্পণ করেন স্থানীয় বৌদ্ধরা সে সময় সম্যক জ্ঞানের অভাবে বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা বা অনুশীলন সঠিকভাবে ও যথানিয়মে করতে পারতেন না। তৎকালীন পার্বত্য জনগণ থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্মের সাথে খুব বেশি পরিচিত ছিলেন না। আদিবাসী *লুরি বা রাউলি* ভিক্ষুদের দ্বারা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলো সম্পাদন করা হতো। এসব *লুরি* ভিক্ষুরা নিজেদেরকে মহাযানী বৌদ্ধধর্মের অনুসারী বলে দাবি করতেন। স্থানীয় সাধারণ জনগণের মাঝে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অভাব দেখে পরম শ্রদ্ধেয় জ্ঞানশ্রী মহাথেরো পার্বত্য চট্টগ্রামে থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্ম পুনরুজ্জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, পার্বত্য অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হলে স্থানীয় চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা প্রভৃতি বৌদ্ধ জাতিগোষ্ঠী থেকে একটি তরুণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সংঘ গড়ে তোলা অপরিহার্য। তিনি জানতেন জ্ঞানই শক্তি। তাই তিনি অনতিবিলম্বে তরুণ বৌদ্ধ শ্রমণদের জন্য বিহার কেন্দ্রিক ধর্মীয় শিক্ষা এবং সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নৈতিক শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন করেন। এর পাশাপাশি তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ধর্মের পুনরুজ্জীবন কার্যক্রম শুরু করেন, যা বর্তমান কালের আধুনিক বৌদ্ধ ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এভাবে পরম

শ্রদ্ধেয় জ্ঞানশ্রী মহাথেরো ১৯৫৭ সাল থেকে নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে থেরবাদী বৌদ্ধধর্মকে আবারও পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনরুজ্জীবিত করেন।

পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাথেরো সুবিধাবঞ্চিত অবহেলিত শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য ১৯৬১ সালে দীঘিনালা উপজেলায় পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি দীঘিনালার বোয়ালখালিতে প্রতিষ্ঠা করেন অনাথাশ্রম স্কুল, পালি কলেজ এবং ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার। ফলে শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাথেরোই ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য পথ প্রদর্শক ও শিক্ষাগুরু। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষার হার যথেষ্ট সন্তোষজনক বলা চলে, যেটি ষাট/সত্তর দশকের দিকে খুবই নগণ্য ছিল। শ্রদ্ধেয় জ্ঞানশ্রী মহাথেরো সেসময় পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং শিক্ষার নিম্নহার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। পর্যায়ক্রমে তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতার কারণে সমাজে বিরাজিত কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ও কুপমণ্ডূকতা সম্পর্কে বুঝিয়ে বলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সমাজের উন্নয়নে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদেরকে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যেতে হবে, যাতে একটি উন্নত সমাজ বিনির্মাণ করা যায়। তিনি শিষ্যদেরকে বলতেন, পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ধর্মগুরুরা সমাজের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। নিবেদিতপ্রাণ বৌদ্ধ ভিক্ষু ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজে শিক্ষা ও উন্নয়নের আলো পৌঁছাবেনা, বলতেন তিনি। শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাথেরো তাঁর শিষ্যদেরকে এভাবে আর্ত মানবতার সেবায় এগিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন।

এরপর শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে দীক্ষাগুরু শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাথেরো তাঁকে পরবর্তী দুই বৎসরের জন্য সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করার পরামর্শ দেন। গুরুভান্তের পরামর্শ শিরোধার্য করে শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তেও মারিশ্যার কাসালং উপত্যকায় অবস্থিত জিবতলী গ্রামের জেতবন মঙ্গল বিহারে অবস্থান নিয়ে সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। সেখানে তিনি হাতে কলমে সমাজ সেবার প্রশিক্ষণ নেন। সাধারণ জনগণের সাথে মিশে সাধারণ জনগণের উন্নয়নের জন্য কিভাবে কাজ করা যায় সে সম্পর্কে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং পর্যায়ক্রমে সমাজ সেবার প্রতি আরও বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এভাবে ছাত্র জীবন থেকে শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে সমাজ উন্নয়ন তথা মানব কল্যাণের কাজে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন। পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাথেরো শুধু দীক্ষাগুরুই নন, প্রকৃত অর্থে শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তের জন্য তিনি ছিলেন একজন কল্যাণমিত্র এবং ভবিষ্যতের পথ প্রদর্শক।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৌদ্ধ জেন মাস্টার ভেনারেবল থিচ্ নাহ্ত হান

শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে তাঁর জীবনে আরও একজন কল্যাণমিত্রের সন্ধান পান। তিনি

ভিয়েতনামের বিশ্বখ্যাত জেন মাস্টার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভেনারেবল থিচ্ নাহ্ত হান। তিনি একাধারে বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের একজন প্রখ্যাত শিক্ষক, লেখক, কবি এবং বিশ্বশান্তির পক্ষে নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। নোবেলজয়ী মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র ১৯৬৭ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য শ্রদ্ধেয় থিচ্ নাহ্ত হানকে মনোনীত করেছিলেন। তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কারটি পাননি, কারণ উক্ত বৎসরটিসহ ২০১২ সাল পর্যন্ত মোট ১৯ বার নোবেল শান্তি পুরস্কার কাউকে প্রদান করা হয়নি।

শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সেসময় ১৯৭৭ সালে শ্রদ্ধেয় জেন মাস্টার থিচ্ নাহ্ত হান একবার বাংলাদেশে এসেছিলেন। মানবাধিকার ও বিশ্বশান্তির পক্ষে জেন মাস্টারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হন এবং তিনিও আপন সমাজের উন্নয়ন কর্মের পাশাপাশি বিশ্বশান্তির পক্ষে কাজ করবেন বলে মনস্থির করেন। পরবর্তীতে শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে দক্ষিণ ফ্রান্সে অবস্থিত পাম্ ভিলেজ মনাস্ট্রিতে এবং কোলকাতায় অনেকবার শ্রদ্ধেয় জেন মাস্টারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তেকে বলেন যে, তথাগত বুদ্ধ সম্যক সম্বুদ্ধ হিসেবে তাঁর বুদ্ধত্ব লাভের বহু আগে বোধিসত্ত্বাবস্থায় নির্বাণ লাভ করতে পারতেন। কিন্তু বোধিসত্ত্ব তা করেননি। কারণ তাঁকে পারমী পূর্ণ করার মাধ্যমে দেবলোকসহ জীব-জগতের অধিকতর কল্যাণের জন্য আরও বেশি করে সক্ষমতা অর্জন করতে হয়েছে। ফলে তিনি বেশি সংখ্যক মানুষকে দুঃখমুক্তির পথ দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রদ্ধেয় জেন মাস্টার বিমল ভান্তেকে ভিক্ষু সংঘের প্রতি তথাগত বুদ্ধের উপদেশ বাণীটি অনুসরণ করার পরামর্শ দেন। বুদ্ধ বলেছিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা বিশ্বের দিকে দিকে বিচরণ করো এবং বহুজনের সুখের জন্যে, বহুজনের হিতের জন্যে, সমাজ ও জগতের কল্যাণের জন্যে মৈত্রীপূর্ণ চিত্তে এমন ধর্ম প্রচার করো, যে ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং অন্তে কল্যাণ নিহিত রয়েছে।"

বাংলাদেশ সফরের সময় শ্রদ্ধেয় জেন মাস্টার অবহিত হন যে, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জনগণ সরকার কর্তৃক পরিচালিত এথনিক ক্লিনজিং এর শিকার হচ্ছেন। সেসময় বহু শিশু তাদের মা-বাবাকে হারিয়ে ছিন্নমূল হয়ে পড়ে এবং হাজারো শিশু পুষ্টিহীনতায় ভুগতে থাকে। ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে তিনি বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জনগণের দুঃখ দুর্দশা লাঘবে কাজ করার জন্য মি. পিয়ের মার্চান্ডকে পরামর্শ দেন।

জনদরদী শান্তিবাদী শ্রী পিয়ের মার্চান্ড মহোদয়

ফরাসী নাগরিক শ্রী পিয়ের মার্চান্ড বিশ্বখ্যাত ভিয়েতনামী জেন মাস্টার শ্রদ্ধেয় থিচ্ নাহ্ত হান্ এর পরামর্শক্রমে ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশে কাজ করতে আসেন। তখন ঢাকায় শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে তাঁকে স্বাগত জানান এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। শ্রী মার্চান্ড মনোযোগ দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের দুঃখ দুর্দশার করুণ কাহিনী শোনেন। তিনি একজন মানবতাবাদী এবং মহামানব গৌতম বুদ্ধের

নিবেদিতপ্রাণ অনুসারী। দক্ষিণ ফ্রান্সে অবস্থিত পাম্ ভিলেজ মনাস্ট্রিতে জেন গুরু শ্রদ্ধেয় থিচ্ নাহ্ত হান্ এর তত্ত্বাবধানে তিনি নিয়মিতভাবে ধ্যানচর্চা করতেন। শ্রী মার্চান্ড নিয়মিতভাবে বিদর্শন ধ্যানেরও চর্চা করেন। ভারতের মহারাষ্ট্র প্রদেশের রাজধানী মুম্বাইয়ের কাছে ইগতপুরী নামক স্থানে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রের আচার্য্য শ্রী সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কাজীর তত্ত্বাবধানে তিনি বিদর্শন ভাবনার শিক্ষা গ্রহণ করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী মানুষের দুঃখ-কষ্ট শ্রী পিয়ের মার্চান্ড এর কাছে অসহনীয় ছিল। ঐ সময় তিনি জেন মাস্টারের সাথে ভিয়েতনামে শিশুদের একটি স্পন্সরশিপ প্রোগ্রামেও স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করছিলেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় (যেটি ভিয়েতনামে আমেরিকার যুদ্ধ নামেও পরিচিত) লক্ষ লক্ষ মানুষ রক্তাক্ত সহিংসতার শিকার হয়েছিল। ১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত এই যুদ্ধ স্থায়ী হয়। বহু শিশু তাদের মা বাবাকে হারিয়ে অনাথ, ছিন্নমূল হয়ে যায়। শ্রদ্ধেয় জেন মাস্টার ঐ সময় স্পন্সরশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে এসব অনাথ শিশুর জীবন বাঁচাতে এগিয়ে আসেন।

শ্রী পিয়ের মার্চান্ড পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম এনজিও এবং এর আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মোনঘরের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ১৯৭৯ সাল থেকে শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করেন। তিনি সেটি করেন 'পারতাজ আভেক লেস অঁফন্ট দু' টিয়্যার মঁদ' নামে একটি সংস্থার মাধ্যমে, যেটি সংক্ষেপে পারতাজ নামে পরিচিত। বাংলায় এর অর্থ দাঁড়ায় 'তৃতীয় বিশ্বের শিশুদের সাথে অংশীদারিত্ব'। তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল ঘোষিত হওয়ায় সেখানে বিদেশি দাতা সংস্থার পক্ষে কোন সামাজিক উন্নয়ন বা জনকল্যাণমূলক কাজ পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রাক্কালে অন্ততঃপক্ষে ২০০টি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা সারা দেশে জনসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছিল। কিন্তু তাদের একটিকেও পার্বত্য চট্টগ্রামে কাজের অনুমতি দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র ফ্রান্সের পার্তাজ সংস্থা থেকে শ্রী পিয়ের মার্চান্ড পার্বত্য চট্টগ্রামের শিশুদের জন্য একটি স্পন্সরশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে বহু কষ্টে এই অঞ্চলে কিছু কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে কাজ করতে এসে শ্রী মার্চান্ড প্রথমে তাঁর জনসেবামূলক কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতাগুলো মোনঘর এবং পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথাশ্রম, কাসালং শিশু সদন, খাগড়াছড়ির গিরিফুল শিশু সদন এবং বান্দরবান মারমা অরফানেজ এর সাথে বিনিময় করেন। পার্তাজের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু ছাত্র বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। তাদের অনেকে বিদেশে পাড়ি জমিয়ে সপরিবারে সেখানে থিতু হয়েছেন। বর্তমানে চাকমাসহ অন্যান্য পাহাড়ি জনগণ ফ্রান্সে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছেন। সেটিও পাহাড়ের জনগণের প্রতি শ্রী পিয়ের মার্চান্ড এর বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক অবদানের একটি।

শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে এবং শ্রী পিয়ের মার্চান্ড বিভিন্ন জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন। তারা উভয়ে সমাজ কল্যাণমূলক কাজের সূত্রে একসাথে পৃথিবীর নানা দেশ পরিভ্রমণ করেন। শ্রী মার্চান্ড সবসময় শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তের কাজে সমর্থন জুগিয়েছেন। তাঁদের এই ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ক পার্বত্য চট্টগ্রামে বহু সামাজিক ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে ১৯৯২ সালে পার্তাজের গভর্ণিং বডির সদস্য নির্বাচিত হন। পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবে তিনি ১৯৯২ সালে সেন্ট্রাল আমেরিকার দেশ হন্ডুরাসের রাজধানী শহর টেগুচি-গালপা-তে পার্তাজের পৃষ্ঠপোষণায় পরিচালিত একটি শিশু কল্যাণ প্রকল্পও পরিদর্শন করেন।

সম্মাননা অর্জন

পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিমল তিষ্য মহাথেরোকে ১৯৯৭ সালে ভারতের মহান স্বাধীনতা দিবসের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশান কাউন্সিল কর্তৃক সম্মাননা প্রদান করা হয়। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক দ্বারভাঙ্গা হলে এই সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সামাজিক উন্নয়ন, মানবাধিকার এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তেকে এই সম্মাননা দেওয়া হয়।

উপসংহার

শৈশবকাল থেকে শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তের জীবন মোটেও কুসুমাস্তীর্ণ ছিলনা। বরং তাঁর জীবন চলার পথ ছিল নানা প্রতিবন্ধকতায় পরিপূর্ণ। মাত্র তিন বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। এরপর খুব কাছে থেকে দারিদ্র্যকে দেখার ও উপলব্ধি করার সুযোগ তাঁর হয়েছে। তবে দারিদ্র্যকে তিনি অভিশাপ হিসেবে নয়, বরং আশীর্বাদ হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ভাষায়, "দারিদ্র্য একটি পবিত্র ও সৎ জীবন যাপনের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি বহুবিধ বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক সম্পদ অর্জনের দ্বার উন্মোচন করে দেয়।" সেই সম্পদকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়েই তিনি তাঁর ধর্মীয়-সামাজিক ও শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড সফলভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে সেই সম্পদকে তিনি এখন জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের মাঝে বিতরণ করছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, দারিদ্র্য একটি সমস্যা হলেও সততাপূর্ণ জীবন যাপনের মাধ্যমে দারিদ্র্যকে জয় করা যায়। যদি কেউ মনের দিক থেকে দরিদ্র হয় এবং বুদ্ধের নির্দেশিত কর্ম ও বিপাক (কর্মফল) এর উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে বাস্তবসম্মত পন্থায় প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা না করে, তখন সমস্যা থেকে মুক্তি সত্যিই কঠিন হয়ে পড়ে। অবশেষে এসব সমস্যা জীবনের উপর অভিশাপ হয়ে ওঠে। শ্রদ্ধেয় বিমল ভান্তে নিজের জীবনে ও সমাজে দ্রারিদ্র্যকে নিবিড়ভাবে দেখার অভিজ্ঞতা থেকে বৌদ্ধ ধর্মের

শিক্ষা এবং নিজের প্রজ্ঞাকে কাজে লাগিয়ে একে পরাভূত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর এই প্রয়াস সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্যকে বোঝার এবং উপলব্ধির একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গিও বটে। তিনি দারিদ্র্যকে আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করে এবং নিজের আত্মশক্তি ও গভীর জীবনবোধের উপর আস্থা রেখে নতুন আশা ও সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য তাঁর নিরলস প্রয়াস বিশেষভাবে নিজ জাতির উন্নয়নে এবং সাধারণভাবে আর্ত মানবতার সেবায় এখনও অসামান্য অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে শ্রদ্ধেয় ভান্তের বয়স ৬৮ হলেও তিনি এখনও আগের মতোই সমান কর্মতৎপর এবং উদ্যমী। তিনি নিজ জাতির উন্নয়নসহ বিশ্বশান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতি সর্বান্তঃকরণে আশাবাদী একজন মহামানব ও পথপ্রদর্শক। আমরা পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিমল তিষ্য মহাথেরোর সুদীর্ঘ, কর্মক্ষম ও শান্তিপূর্ণ সুস্থ জীবন একান্তভাবে কামনা করি। সবেব সত্তা সুখিতা ভবন্তু। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

প্রফেসর পি. জে. চাকমা থাইল্যাণ্ডের স্থায়ী বাসিন্দা এবং রাজধানী ব্যাংককের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক।

তিলিপের সন্ধানে

স্মরণিকা চাক্‌মা

কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে জনজীবনের বিচরণ। কি শহর কি গ্রাম তা বুঝে উঠা দায়। অর্ধ শিক্ষিত তিলিপের এমন চিত্র অপরিবর্তনীয়। শীতকাল বলে কথা নয়, দশ-পনের বছর ধরে তিলিপের একই অবস্থা। জন-জীবন বাইরে থেকে স্বাভাবিক যতই মনে হোক জটিল সমস্যা ঠিকই অভ্যন্তরে পুঁতে আছে। এক সময় তিলিপের দবদবা চেহারা ছিল, এমনই গল্পের দীর্ঘশ্বাস সাঝে মধ্যে চর্চা হয়, শুনেছিলাম। তবে কেমন ছিল? গভীরে গেলে হয়তো ব্যাপারটি উদ্‌ঘাটন করা যাবে।

'তিলিপ' ভ্রমণের সুযোগ আসে চাকুরির সুবাদে। বাংলাদেশে 'তিলিপ'কে আলাদাভাবে দেখার সুযোগ নেই। আর দশটা মফস্বল শহরের মত। এখানে দেখেছি শিক্ষার ভেতর অশিক্ষা, অশিক্ষার ভেতর নবজাগরণ। এখানকার মানুষ তিন-চার সারিতে পাশাপাশি থাকে দোসরের মত। আপাত দৃষ্টিতে দোসর মনে হলেও অভ্যন্তরে জিয়ে আছে দা-কু-মড়ার সম্পর্ক। বেশি না, মাসখানেক থাকলে এই ধারণাই মনে হবে যে কোন আগন্তুকের।

পিচ ঢালা, উঁচু-নিচু ও মাঝখানে মাঝখানে সমতল পথ দিয়ে শ্যামলী' বাসটি 'তিলিপ' শহরের চৌমুহনী ছেড়ে বাস স্ট্যান্ডে এসে থামল। অপরিচিত জায়গা। অপরিচিত মানুষ জন। সরকারি রেস্ট হাউজের কথা আগেই শুনে এসেছি। বাসস্ট্যান্ড থেকে একজন আদিবাসী রিকসাওয়ালার রিকশায় চেপে বসে পড়লাম। রিকসাওয়ালা বুঝতেই পেরেছিল এই শহরে আমি নতুন, সে অমনি আমার ক্যাজুয়াল ড্রেস দেখে 'স্যার' সম্বোধন করে বলল, 'কোথায় যাবেন স্যার?' আমি উত্তরে রেস্ট হাউজের কথা বলি। আমি পথ চিনি না, সে নিজেই নিয়ে চলল। লোকটি বেশ সুঠাম দেহের অধিকারী। মনেই হচ্ছিল, তার পায়ের প্যাডেলের টানে রেস্ট হাউজ যত দূরেই হোক দ্রুত পৌঁছে যাব। প্রায় ২০ মিনিটে পৌঁছলাম। পৌঁছে রিকসা থেকে নেমে ভাড়া কত জিজ্ঞেস করতেই বলল, ১০ টাকা। আমি ভাবলাম, নতুন মানুষ ভেবে সে বেশি টাকা চায় কিনা। ঢাকা শহরে রিক-সাওয়ালাদের ভাড়া চাওয়া মানেই মুহূর্তে নয়-ছয়, আর এখানে সুঠাম-দেহী রিকসাওয়ালার সারল্য এবং প্রতারনাহীন উত্তর প্রথম দিনেই এই এলাকার মানুষদের সম্পর্কে এমন ইতিবাচক ধারণার জন্ম দিল।

রেস্ট হাউজে এক মাস কেটে যাচ্ছিল। পরের মাসে কোথাও বাড়ি ভাড়া নিব, ভাবছি। এর মধ্যে অনেক বাঙালী-অবাঙালী মানুষের সাথে সখ্যতা গড়ে উঠতে লাগল। ভার্সিটিতে পড়াশুনাকালে কৌতূহলবশত এক-আধটুক এই অঞ্চলের ইতিহাস পড়েছিলাম। পত্র পত্রিকায় মাঝে মধ্যে এই এলাকার বিষয়ে নানা ঘটন-অঘটন খবর পড়া হত। ভার্সিটিতে পড়াশুনাকালে এই এলাকার কিছু বন্ধুর সংস্পর্শে এসেছিলাম। তাদের কাছ থেকে তিলিপের সুখ-দুঃখের কথা এবং বর্তমান ছিন্ন বিচ্ছিন্ন পরিস্থিতিসহ বই বহির্ভূত বহু অজনা সত্য কথা জেনেছিলাম। জেনেছিলাম, এই এলাকায় এক সময় কোন বাঙালীই ছিল না। স্বাধীনতার বহু পূর্বে বাঙালীরা আসত তবে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য নয়। শুনেছি, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কিছু সংখ্যক এবং ক্রমান্বয়ে এরশাদ, জিয়াদের আমল থেকে ধাপে ধাপে বহু বাঙালীর স্থায়ী অনুপ্রবেশ ঘটে। এখানে আসা ও স্যাটেল হওয়া বাঙালীরা আদি অধিবাসীদের আছে স্যাটেলার নামে পরিচিত। বলে রাখি এখানে আসার আগে আমি ঢাকায় জেনিছিলাম, 'সেনাবাহিনী' প্রভূর একছত্র রাজকীয় অবস্থার কথা। 'সেনাবাহিনী' যাদেরকে জাতিসংঘের শান্তি মিশনের শান্তির দূত বলা হয়, অবাঙালীদের কাছে তাদের এই ধারণা উল্টো। সত্যিকার অর্থে অবাঙালীদের দৃষ্টিকোণ কবি গুরুর দৃষ্টিতে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের ব্রিটেনে থাকা ভালো ইংরেজ আর ভারতীয় উপমহাদেশে শাসন করতে আসা খারাপ ইংরেজদের মত। তিলিপের আদিম অধিবাসীদের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিকোণ অবান্তর কিংবা অস্বভাবিক নয়। পাশা-পাশি বিভিন্ন সময় আদিবাসীদের ন্যায্য জায়গা-জমি দখল করে স্যাটেল করা হয়েছে যাদের তাদের দৃষ্টিতে 'সেনাবাহিনী' মানেই উপকারী বন্ধু। তিলিপে 'সেনাবাহিনী' ধারণাটি বাঙালী ও আদিবাসীদের নিকট দ্বৈত সত্তার প্রতীক। আমার প্রশ্ন 'সেনাবাহিনী' প্রভূর এই দ্বৈত চারিত্রিক সত্তা হবে কেন? সহজাতভাবে জানি যে, সেনাবাহিনীর মত নির্ভরশীল পেশায় যোগদানকালে অঙ্গীকার করতে হয় যে, দেশ ও দেশের সকল জনগণকে সমানভাবে নিরাপত্তা ও সহায়তা প্রদান করার কথা। অঙ্গীকারের এই কথাগুলো মনে রাখা উচিত ছিল তাদের। সাথে এটাও মনে করা উচিত যে, তিলিপের বাঙালিদের মত অবাঙালি আদিবাসীরাও রাজস্ব, ভ্যাট, কর, খাজনা দিয়ে সেনাবাহিনীকে সরকারের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অন্ন যোগাচ্ছে।

একদিন ফিল্ড ভিজিটকালে এক আদিবাসী মহিলার কাছে বলতে শুনেছি সোবাহিনীরা নাকি রক্ষক আর ভক্ষক দুই। তার কাছে জেনেছি সেনা সদস্যদের দ্বারা আদিবাসী নারীর লাঞ্ছিত হওয়ার কথা। এই সব কথা আজ থাক পরে আরেকদিন হবে। তবে এটা বোঝার বাকি নেই, সোনার বাংলা স্বাধীন হয়েছে ঠিকই কিন্তু মানুষ স্বাধীন হয়নি। এখনো মানবতা আর্তনাদ করে ফেরে এই বাংলার মাটিতে।

'তিলিপ' কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের' 'তেলানাপোতা' গ্রাম নয়, যেখানে মহামারি, অশিক্ষা, কুসংস্কার লেগে থাকে। তিলিপের মানুষ-জন বেশ শিক্ষিত, দক্ষ, পরিশ্রমী তবে সহজ সরল। নয়-ছয় বোঝে না। সহজেই মানুষকে আপন করে নেয়। আমি এখানে ধীরে ধীরে

অনেক কিছু আবিষ্কার করছি। আমি পেশায় সরকারি উন্নয়ন কর্মী। সেই সুবাদে বিভিন্ন জনের সান্নিধ্যে এসেছি এবং বিভিন্ন জন কাছে আসতে চেয়েছে। কেউ স্বার্থ হাসিলের জন্য কেউ বা সখ্যতা ও মায়া বাড়ানোর জন্য। আমার রেস্ট হাউজের পিয়ন খাওয়া-দাওয়াসহ বিভিন্ন বিষয়ে যথেষ্ট সহযোগিতা করে আসছে। নাম রথীন্দ্র। সে বেশ সখ্যতা গড়ে তুলেছে আমার সাথে। বয়সে প্রবীণ, তবে তিলিপের অনেক পুরাতন ইতিহাস তার জানা। সন্ধ্যায় তার সাথে চায়ের চুমুকে বহু প্রশ্ন, কথার ঝুড়ি নিয়ে বসি। মানুষটি বেশ সহজ-সরল, রসিক প্রকৃতির। দাড়ি গোঁফ কামানো, লম্বা ও পাতলা গড়নের। ঢিলেঢালা হালকা কিংবা ফ্যাকাসে এক রঙা শার্ট আর কালো প্যান্ট তার নিত্য দিনের বেশভুষা। রেস্ট হাউজে আমার পাশের কামরায় আরো একজন সরকারি চাকুরে থাকে। তার সাথে রথীন্দ্রের তেমন সখ্যতা নেই, আমার মতো। কথায় কথায়, একদিন রথীন্দ্রকে বলি "আচ্ছা তিলিপের বহু ঘটনা মাঝেমধ্যে বেশ ঘটাকরে পত্রিকা ও মিডিয়াতে ছাপানো হয়। যেমন; বাঙালী স্যাটেলারদের দ্বারা আদিবাসীদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া, আদিবাসী নারীর উপর ধর্ষণ ঘটনা, পার্টি-বিপার্টির অপহরণ, চাঁদা আদায় ইত্যাদি। এগুলোর সত্যতা ও কারণ কি জানেন?" বলে রাখি, এক সময় আদিবাসীদের দাবি আদায়ের সংগ্রামে রথীন্দ্র তুখোর যোদ্ধা ছিল। তার সাথে আলাপাকালে নিজের সম্পর্কে বলতে শুনেছিলাম। আমার প্রশ্নের প্রেক্ষিতে রথীন্দ্র একটু কষ্ট চাপা সুরে আপন মনে বলতে লাগল,- "এখানকার আদি অধিবাসীরা মূলত শাসক গোষ্ঠীর দ্বারা প্রতারিত হয়ে আসছে বহুকাল আগে থেকে। ভেবেছিলাম বহু যুগের দুঃখের অবসান বুঝি ১৯৯৭ সালের ২রা ডিম্বেরে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তির মাধ্যমে ঘটবে। যে চুক্তির জন্য বহু যুগ সংগ্রাম করে এসেছি তা আজ কেবল কাগুজে হয়ে আছে। অথচ এই চুক্তির জন্য ঘটে গেছে, গণহত্যা, বাড়ি-ঘর জ্বালাও-পোড়াও, নারী ও শিশু হত্যাসহ লোমহর্ষক বহু ঘটনা। কথা বলতে বলতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে এক সময় সে থেমে গেল। পাশে রাত হয়ে আসছিল প্রায়। অমনি, সে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করল। অবশ্যই নিরাশও করল না, পরবর্তীতে এর বাকি কিস্তি বলার ওয়াদা করে সে বিদায় নিল।

এদিকে সন্ধ্যার পর তিলিপে মানুষের ঘোরাঘুরি কমে আসে। কেননা আজকাল দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ভালো নয়। এনিয়ে দেশে ১৫ বার সংবিধান পরিবর্তনও হয়ে গেছে। তাছাড়া তিলিপের আঞ্চলিক রাজনীতির গতিবিধিও দ্বান্দ্বিক হয়ে উঠছে দিনের পর দিন। আমি সেদিন রাতের খাবার শেষে ঘুমুতে গেলাম। অফিসের ফাইল দেখাই হল না। রাত ১২টা বেজে যাচ্ছিল তবুও ঘুম দু-চোখে আসছিল না, কেবল রথীন্দ্রের কথাগুলো কানে বাজছিল, আর চিত্রকল্প হয়ে ধরা দিচ্ছিল। আর কৌতুহল জাগছিল পরবর্তীতে সেকি কি ঘটনা বলবে? এভাবে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোর সাতটায় পরের দিন ঘুম থেকে উঠলাম। প্রতিদিন আমার ভোর হয় সকাল ছয় টায়। আজ একটু দেরিই হয়ে গেল।

আজ অফিসের পূর্বপ্লান মোতাবেক ফিল্ড অফিসারকে নিয়ে তিলিপের 'হরিচরণ কার্বারি পাড়া' গ্রামের উদ্দেশ্যে বের হলাম। ফিল্ড অফিসারটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোক। আদিবাসী গ্রাম ও মানুষ সম্পর্কে সে ওয়াকিবহাল। আমি মনস্থির করলাম হাঁটতে হাঁটতে গ্রামটির সচিত্র পরিদর্শন করব। তার সাথে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আজ অফিসের মোটর সাইকেলটির অলস সময় কাটবে, পাশে এমনটি মনে হচ্ছিল আর হাঁটছিলাম। শহর থেকে মাইল খানেক পশ্চিমে হেঁটে গ্রামের মুখে এসে পড়লাম। গ্রামের মুখ থেকে ভেতরের দিকে কিছু দূর হেঁটেই একজন মুরুব্বী গোছরের হাইস্কুল শিক্ষকের দেখা মিলল। তার সাথে সৌজন্য কথাবর্তা সহযোগে পরিচতি হলাম। পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি শিক্ষক মশায় বিনম্র সুরে তার স্কুলে চায়ের দাওয়াত দিয়ে বসলেন। আমি তাকে দুপুর ১২টার পর দাওয়াত রাখার স্বীকৃতি দিলাম। এরপর ফিল্ড অফিসারকে নিয়ে গ্রামের গভীরে ঢুকার কথা বলে বিদায় নিলাম। তিনিও হাঁটতে হাঁটতে আকাবাকা উঁটু-নিচু পথ বেয়ে স্কুলের দিকে ধাবিত হলেন। পথেই গ্রামের কার্বারির দেখা মিলল, তার সাথে প্রকল্পের উপকার ভোগীদের বিষয়ে সামান্য আলোচনা করলাম। এভাবে দুই একজন রাস্তার ধারের বাসা-বাড়ির মহিলাদের সাথে কথা বলতে লাগলাম। তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করলাম। তাদের কথা শুনলাম। এতে মনে হল তাদের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি কর্মকান্ড নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। তাদের কেউ কেউ বেশ আগ্রহী হলেও কেউবা পাশ কাটিয়েও চলে যাচ্ছে। এক সময় ঘড়িতে চোখ পড়তেই ১২টা বাজার কথা মনে হয়। তখন মহিলাদের সহিত কথার পাঠ চুকিয়ে স্কুলের দিকে রওনা দিলাম। এঁকে বেঁকে রাস্তা আর পাহাড় চড়ার শখ হয়তো পূরন হত না যদি, মোটর সাইকেল দিয়ে আসতাম। চারিদিকে গাছপালা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে স্কুলে পৌঁছে গেলাম। শিক্ষক মশায় বেশ আগে থেকে আমাদের আসার অপেক্ষায় ছিলেন, চোখে মুখে ব্যস্ততা দেখে বুঝতে দেরি হল না। শিক্ষকদের অফিস রুমে দুটি চেয়ার এগিয়ে দিতেই বসে পড়লাম। বসতে না বসতেই এক পলক কক্ষটির অভ্যন্ত চোখ বুলিয়ে উঠার আগে স্কুলের পিয়ন পাশে দাঁড়িয়ে। তার হাতের এক পাশে দুটি চায়ের কাপের ট্রে আর অন্য হাতে টিপ বিস্কুতের একটি প্যাকেট নিয়ে হাজির। সম্ভবত শিক্ষক মশায় আগে থেকেই আনিয়ে রেখেছিলেন। আমি কৌতূহলী দৃষ্টিতে চা খেতে খেতে শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে বসলাম, "এখানকার শিক্ষার অবস্থা কেমন?" তিনি অত্যন্ত অনুযোগের সহিত প্রশ্নের উত্তরে বলতে লাগলেন, "এই গ্রামে এক সময় শিক্ষার মান মোটামুটি ভালোই ছল। পূর্ব থেকেই গ্রামে যারা একটু শিক্ষিত হয়েছে তারা আর থাকেনি, শহরের দিকে ছুটেছে। গ্রামে প্রাইমারি ও হাইস্কুল আছে। প্রাইমারি শেষ তো হাইস্কুলের জন্য ছেলে মেয়ে নিয়ে শহরে দৌড় দিয়েছে অভিভাবকেরা। গ্রামে যারা একটু পয়সাকড়ি করতে পেরেছে কিংবা চাকুরীজীবী অভিভাবক রয়েছেন তারাই সন্তানদেরকে শহরে পাঠাতে পেরেছে। পাশে গরীব অভিভাবকদের যাদের কোন উপায় নেই তাদের ছেলেমেয়েরা এখানে পড়ে আছে।

শান্তি চুক্তির এই কয় বছরেই এলাকার শিক্ষার হার যেমন বেড়েছে তেমনি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উপর অবুঝ ভাতৃঘাতি রাজনীতিরও প্রবেশ ঘটেছে। যার ফলে হাই স্কুল লেভেলের ছাত্রদের মাধ্যে প্রাইমারিতে যাদের সম্ভাবনা দেখা গেছে তাদের ধারাবাহিকতা আর থাকেনি। এস এস সি ও এইচ এস সি তে গিয়ে তাদের মধ্য থেকেই বিশি ফড়ে পড়ার সংখ্যাটা বেরিয়ে আসছে। এই পরিত্যক্ত ছাত্ররাই জীবনের দিশাহীনতায় কোন একসময় পার্টি কিংবা গ্রুপে নাম লেখাচ্ছে। এককালে শিক্ষা ক্ষেত্রে গ্রামের একটি সুনাম ছিল। আশেপাশের গ্রাম থেকেও এখানে পড়তে আসত। এমনকি গ্রামের অনেক মেধাবী ছেলে মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যালসহ বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে গিয়েছে কিন্তু বর্তমানে তার ভাটা পড়েছে। আজকাল ছাত্রদের একটা বৃহৎ অংশ গ্রামে বিভিন্ন সময় চাঁদা, দাবি-দাওয়া, অপহরণসহ পার্টির নানা কাজে জড়িয়ে নিজেদের স্বর্ণালী শিক্ষা জীবনকে বিনস্ট করছে। এর সাথে সাথে পিতা-মাতার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নগুলো কবরে দাফন হচ্ছে। বেশ কয়েক প্রজন্ম ধরে এই অবস্থা চলতে থাকলে আদিবাসীদের মধ্যে মেধাশূন্য হয়ে পড়বে। এই আশংকা প্রকাশ করে শিক্ষক মশায় নির্দ্বিধায় বলে উঠলেন যে, এমন শিক্ষা পরিস্থিতি চলতে থাকলে হয়তো একদিন আদিবাসীরা শাসক প্রভূর নিকট হতে দাবি-দাওয়া আদায়ে অসমর্থ হয়ে কিংবা নিজেদের যোগ্যতাহীনতার প্রমাণ দিবে।"

'হরিচরণ কার্বারি পাড়া' গ্রামের মত আরো অনেক গ্রাম আছে যার পরিস্থিতি অনেকটা এমনই। গ্রামের মানুষ শিক্ষাকে চিনেছে কিন্তু বেশি দূর এগোতে পারছে না। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই প্রতিকূল অবস্থা তিলিপ'কে ধীরে ধীরে আড়ষ্ট ও অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।, শিক্ষক মশায়ের বক্তব্যে ধারণা পেলাম। এভাবে চলতে থাকলে 'তিলিপ' অর্ধ শিক্ষিত ও অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করীদের পর্যায়ে পতিত হবে। শিক্ষক মশায়ের সাথে আজকের আলাপ বেশ জমে উঠছিল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুপুর দু-টার আগেই আলোচনা থামিয়ে দিতে হল। ঠিক দু-টা বাজতেই ফিল্ড অফিসারকে নিয়ে অফিসের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে রওনা দিলাম। দিনের পর দিন নিত্য নতুন মানুষের সঙ্গ আমাকে তিলিপের গভীরে ধাবিত করছে। তিলিপের বহু সত্যাবৃত ঘটনা ও সমস্যা উম্মোচিত হচ্ছে একের পর এক। ফলে 'তিলিপ'কে জানতে আরো বেশি কৌতূহলী হয়ে উঠছি। আজ অফিসে পৌঁছার রাস্তা দীর্ঘ মনে হচ্ছিল। আসার পথেই দেরি হয়ে গেল। দুপুর গড়িয়ে লাঞ্চ করতে করতে বিকেল হয়ে আসছে প্রায়। প্রতিদিনের মত আজও অঘোষিত কারণে বিকেল কাটতেই সন্ধ্যার মধ্যে জন-জীবনের কোলাহল শান্ত ও গম্ভীর হয়ে এল। ক্লান্ত ও শ্রান্ত দেহে পুরাতন কোন অসমাপ্ত কথার পূর্ণতা নিয়ে আগামীর ভোরের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছি।

ওমর খৈয়ামর রুবাইয়াৎ

চাকমা অনুবাদ : সুগত চাকমা ননাধন

বিশ্বখ্যাত ইরানী কবি ও বিজ্ঞানী ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ কবিতাগুলির সফল অনুবাদ ইংরেজীতে করেছিলেন এ্যামেরিকান কবি এডওয়ার্ড ফিড জেরাল্ড। একসময় তাঁর কবিতার ভাবধারা থেকে ইংরেজীতে "Eat Drink Be Merry" বলে যে কথাটি চালু হয়েছিল, তা তো আজো চালু রয়েছে। এখানে তার ইংরেজী অনুবাদ থেকে কয়েকটি রুবাইয়াৎ-এর চাকমা অনুবাদ দেওয়া হলো। উল্লেখ্য যে ১৯৭৬ সালেই এই চাকমা অনুবাদের কাজটি করেছিলাম। ইতিমধ্যে এগুলির কোনো কোনোটি নানা সময়ে নানা সংকলনে প্রকাশিত হলেও পাঠকের আগ্রহে তা আবারো প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হলো। খৈয়াম প্রকৃতি এবং প্রকৃতির রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ , সৌন্দর্য, মাধুর্য ও আনন্দকে এবং আনন্দ প্রদানকারীকে সুরা ও সাকী রূপে বর্ণনা করেছেন। এস্থলে সেই অর্থেই অনুবাদগুলি করা হয়েছে। সৃষ্টি ও স্রষ্টার ব্যাপারে তার দর্শননির্ভর কয়েকটি রুবাইয়া-এর চাকমা অনুবাদও করা হয়েছে। দুই-তিনটি রুবাইয়াৎ-এর অনুবাদের ক্ষেত্রে ছন্দের বেলায় আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও পশ্চিম বাংলার কবি কান্তিঘোষের বঙ্গানুবাদ থেকেও কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁদের কোনোটির ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে। চাকমা অনুবাদগুলিতে কবিতাগুলির আঙ্গিক " a- a- b-a" রাখা হয়েছে। কোনোটিতে চাকমাদের পরিবেশ ও প্রতীকের সাথে সঙ্গতি রেখেও ভাবানুবাদ করা হয়েছে। আগ্রহী কবিতামোদীরা ফিড জেরাল্ডের মূল অনুবাদের সাথে মিলিয়ে এই কবিতাগুলির ভাব উপভোগ করতে পারেন । প্রথমে এডওয়ার্ড ফিড জেরাল্ডের একটি বহুল পরিচিত জনপ্রিয় ইংরেজী অনুবাদের নিচে চাকমা অনুবাদটি দিয়ে শুরু করা হলো -

Here with a loaf of bread beneath the bough
A flask of wine a book of verse and thou,
Beside me singing in the wilderness
And the wilderness is paradise e-now.
[Translated by Edward Fitzerad]

কবি কান্তিঘোষের বঙ্গানুবাদ থেকে-

সে নিরালা পাতায় ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়,
খাদ্য কিছু পেয়ালা হাতে, ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।
মৌন ভাঙ্গি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর-
সেই তো সখী স্বর্গ আমার, সেই বনানী স্বর্গপুর।
[কান্তিঘোষ অনূদিত]

স্বকৃত চাকমা অনুবাদ :
হেল এই ধেলা-তলে ধাঘাধাঘি বোই ভেলে
খুলি খেই ভাতমজা মদ'চুমা পেহ্লে পেহ্লে-
কায় থোক মোধু বোই আর তর গানান
গোরি যোক স্বর্গ আমা এই ঝারান।

২)
আয় আয় সমারি ধাল ধাল মদ্তান ভোগ গোরি জনমান
চেরোকেইত্তে ফাগুনর রাঙাঘান, সোরি যিয়ে দুঘদিন' সে- জারান,
সময়র পেক্কুয়া জনমর গীত্তানি লোইনে উরিবার কাজেল
উরিল উরিল দুয়াগান মেলিল, কোনোদিন ন পেবং দেঘাগান।

৩)
আহ পরানি, ধাল-না মদ্তাম পী-খেবং
জনমর বেক দুঘ দুনজনে ভুলিবং।
কেল্যার কধা লোই কি হব?
কেল্যা- দ আমিয়্য পুরানিত মিঝিবং।

৪)
আহ সমারি ধাল-না মদ্তান কায় আয়
থেঙ'তলে সময়ান চা-না ঘুম যায়।
ঝারি ফেল দুঘ'কধা এযেত্তে ডরান,
আঘেদে মাধানান কাদেযেই সুঘমায়।

৫)
কান্তিঘোষের বঙ্গানুবাদ থেকে-

সেই তো সখী মাটির কোলে হবেই শেষে পড়তে ঢলে
তাই বলি, আয় হীম অতলে তলিয়ে যাবার আগে
ভোগ করে যাই প্রাণটা হেসে বুক ভরে নেই ভালবেসে
এই জীবনের যে ক'টা দিন সামনে আজও জাগে।

স্বকৃত চাকমা অনুবাদ :

সুক্খান দ খানক্খন্যা জনম্মুয়া-দ ন-থেব
ধালি দেনা মদ্তান স্বর্গআন্দ কায় এব।
আহ নাগরি যা পারি খে-লোই এ-জুয়ত
মোরি গেলে এ জনম স্বর্গলোই কি হব?

৬)
আয় আয় সমারি খৈয়ামর লগে আয়-
জ্ঞানীবেক ছারিনে, জনমান বোই যায়-
বেক কধা মিঝা এক্কানই থিক-
ঝোরি-যিয়া ফুল্ল কোনোদিন দেঘা পায়?

৭)
উবর তলে ভিদর বাহ্রে দেঘর যা তুই মিঝার ফাক,
খানক্খন্যা ছাবার খারা চলের যেন পুতুল নাচ?
এই পিত্তিমী আম্মক দেচ এযন যানার ধর্মঘর,
যাত্রা শেঝে হাঝার দাঘি ন পেবে তুই কারর লাগ?

৮) অনুবাদ থেকে-
এক লহমা সময় আছে সর্বনাশের মধ্যে তোর
ভোগ সায়রে ডুব দিয়ে কর একটা নিমেষ নেশায় ভোর
আয়ুর তারা পড়ছে খসে মরণ ঊষার চরণ'পর-
যাত্রা যে কাল করতে হবে ফুরিয়ে নে সব ত্বড়িৎ কর।

স্বকৃত চাকমা অনুবাদ :

ইক্কুয়া নিঝাচ সময় আঘে খদাক্তালাক্ পোরিবার তর
মদ-সাগরত ডুব্দি তুই ইক্কুয়া রেইত গর-না পহর,
আয়ূর তারা পরের ঝোরি মরন কালর থেঙর তলে-
যাত্রা তর গরা পোরিব ফুরেল বেক ঝাদিদেই গর।

৯)
ক-ধ দিন ভাবি চাং গলাবর রাঙাগান কার যেন লো- রঙ,
কার যেন বুগ'রচ মিজি আঘে পাওরত এক-বুক দুঘ'সং।
গলাবর তলামায় কন্না যেন ঘুম যায়,
কন্না যেন পোরি আঘে ঘাচ তার চোঘ'ভং।

১০)
বরগাং- কুল্যা চোক- জুরেইয়া হেল ঘাঝর ঝার
বাচ্যেই আঘে উভা-মু কননা জানে কার?
বচ্-না সিধু লাহরে লাহরে কির্বা গোরি পুচ্ছা তারে
কোন গাভুরি পোরি আঘে খাদি মেলি তার।

১১)
গদা জনম পোরিনে মুই যা জানিলুং
গদা জনম তোগেইনে মুই যা কুরেলুং
যেবার লক্কে সেই বিজিগুন ছিদেই ছিদেই যাং-
পানির গঙে সোমেইনে মুই, ফিরনি বুইয়ারে উরিলুং।

১২)
রিনি চ সেই বীর সুলতান মাহমুদ-
পোজি যিয়ে কবরত হোই যিয়ে ভুত।
হাদি যায় গাধাভুয়া ন ডরায় এক্কায়্য
হুরি যায় তা- শিরাত একখুচ দ্বি-খুচ।

১৩)
হাদি যাদে পত্থানে একদিন থিয়েলুং,
আম্মক কারবার দ্বিভা চোঘে দেঘিলুং।
কোনো কুমে কধা কন কোনো কুমে ন কন
আম্মক কারবার মনে মনে ভাবিলুং।

১৪)
''এই সংসার মিঝা হয় মহাশয়?''
কল কোনো জন। "সেন্ নয় সেন্ নয়"
কল আর জন, "যে মরে বানেইয়ে যিয়ত্তুন-
আর সিধু নিলে হয়। "

১৫)
"সালে কিও ক্যা দোল কিও ক্যা দোল নেই?
উত্তর তার জান কোনো ভেই?"
রাগে যেন কোনো কিও মাদিল,
"হাত বুঝি লরে তার মাধা ঘুরেনেই?"।

১৬)
কদদিন গুরাভুয়া খারায় খারায়-
মন সুঘে কদকিঝু বানে' বানে' যায়,
সেই তার খারাগান।" বেক্কুনে মাদিলাক,
"দিন' শেঝে ফেলে যায় ভাঙায় গরায়।"

১৭)
এনকালে ইক্কুয়া কুম্ মাদি উধিল,
"কন্না মরে বানেইয়ে পুঝার গোরিল?"
বেক কুমে চুপচাপ বানা ক-ল তে,
"কন্না মরে বানেইয়ে কন্না তারে বানেল?"

১৮)
"কুত্তুন এলুং কুধু যাঙর সেঝান চিদা হবলা থোক,
সেঝান চিদা গোরি চেবার পোরি আঘন সাগর - লক।
খানাদানার মানুচ মুই ভাবি চেবার সময় নেই
ভাগ্যদেবীর বিগিদি হাঝি মদর রঝে ভাঝিই যোক।

১৯)
যেধকদিন বাঝি আঘি খেইনে দেইনে গেবং গান,
দ্বিভা চোক মেলি আঘি যেধকখন চেবং এই সংসারান।
ফিরি যেবার সময় হলে মরনানে তুলি ললে
ফেলে যেবং- এ-দ হাওঝর জনমান।

২০)
শুন শুন সমারি ম'কধা শুন
মোরি গেলে মরনত যেবং ঘুম,
ধাল ধাল বানা মদ গলজত মোরি গেলে দুনজন মরনত
দ্বি-চোঘত লামিব বানা ঘুম।

২১)
এই পিত্তিমীর ধর্ম-ঘরত এযন যানার খারা,
দিন্ন থায় খুলা ইয়ান, রংগ-রঝে সব্ পুরা।
সাগর পোথ্যা এইনে ইধু থেইনে যান খানক্খন,
রেত্তুয়া এলে আনধার-বুগত হোইনে যানদে সারা।

২২)
ও বিধু যা কিঝু দোল্ যা কিঝু গম্ যা কিঝু কোচপানা,
সময়র গাঙানত ভাঝি যার , হর অজানা।
যারা ইধু এলাক এ-দ কোচ পেলাক
সেই বেক প্রেমিকে হারেলাক একদিন জীবনর থিকানা।

২৩)
আহ চানান ! দোল চানান ! হাওঝর চানান!
কোনোদিন দেবে তুই ফাগুনর মাধানান-
মরে ছারি গায় গায় ফিরি এচ্যে পিত্তিমীত,
সমারিভুয়া চেই আঘে আহ চোঘ'পানি সে-মুয়ান!

২৪)
আহ ! পরানর ফাগুনানে শেচ হর লোই
হাওঝর চানানে দুবি যার লোই,
হাওঝর পেক্কুয়া উরি যেবগোই,
ন জানং কমলে ফিরি এবগোই।

২৫) কবি নজরুলের 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' বইয়ের অনুবাদ থেকে-

আবার যখন মিলবে হেথায় শরাব সাকীর আঞ্জামে
হে বন্ধুদল একটি ফোঁটা অশ্রু ফেলো মোর নামে!
চক্রাকারে পাত্র ঘুরে আসবে যখন সাকীর পাশ,
পেয়ালা একটি উলটে দিও স্মরণ করি খৈয়ামে।
[নজরুল অনূদিত]

স্বকৃত চাকমা অনুবাদ :

আর যেক্কে দেঘা হবা রঙ'মেলাত বেক্কুনে,
চানান যেক্কে ফেলেব পহর তমা-মাধাত সেক্কেনে
মর সমারি তুলি ললে সুধার গলচ মুয়ত তার,
গলচ ইক্কুয়া উল্যেই দিয়্য ঈদত তুলি সেক্কে মে।

[আদি অনুবাদ : ১৯৭৬ । পরিমার্জন : রাঙ্গামাটি,
জুলাই , ২০১৪]

কবিত্ব
এডিট দেওয়ান

ওকে আমি আজকেই খুন করবো – কবি জোর দিয়ে নিজেকে বললো। কবি এখন একা। বাড়ীতে এখন কেউ নেই। কিন্তু সুযোগ পাওয়া মাত্র সে খুন করবে। একটি সেকেন্ড ও সে নষ্ট করবে না। ওর প্রিয়তমা স্ত্রী তাদের মেয়েকে স্কুলে দিতে গেছে। আজ অফিস বন্ধ তবে স্কুল খোলা। তার স্ত্রী অফিসে না গিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। সে এখন ও সকালের নাস্তা খায় নি। খাবার টেবিলে সাজানো আছে। সে এলোমেলোভাবে কখনও দরজা, কখনও ড্রয়িং রুম, কখনও বা ডাইনিং টেবল হয়ে পায়চারি করতে শুরু করল। আয়তাকার খাবার টেবিলের উপর ঢাকনি দিয়ে ঢাকা প্লেট। তার পাশে দুইটি তরকারির বাটি এবং একটি ছোট্ট লবণ রাখার পাত্র। চারটা গ্লাস। প্লাস্টিকের প্লেটের উপর এক কানি কলা। চেয়ারগুলি খাবার টেবিলের ভিতরে ঢুকানো। সবে ৯ টা বেজে গেছে। সূর্য ফুটতে শুরু করেছে। জানালা দিয়ে প্রবেশ করা হলদে আলোটা লাল টেবিলম্যাটের সাথে মিশে এক অপরূপ আভা সৃষ্টি করেছে। টেবিলের পাশের বেসিন থেকে টুপ টুপ করে পানি পড়ছে। যাতে মেঝে ভিজে না যায় সেজন্য তার নিচে একটি বালতি রাখা আছে। বালতি ভরে গেলে পানিটা ফেলে দিয়ে কবিকে আবার তা পাততে হবে। মিস্ত্রিকে তিন দিন আগে বলা হয়েছিল কিন্তু কোন খবর নেই।সাধারণ অর্থে কবি কোনও কাজ করে না। কাজ বলতে অফিসের কাজ। কবি মনে করে তাঁর কাজই তো কবিতা লেখা। এটার চাইতে বড় কাজ আর কি হতে পারে। চিন্তা করতে হয়, বিভিন্নভাবে ভাবতে হয়। জাগতিক জিনিসগুলোকে শিল্পিত চোখ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। লৌকিক জিনিসগুলিকে অলৌকিকভাবে অনুধাবণ করাই কবির কাজ। আধ্যাত্মিকতার মাঝেই কবিকে বিচরণ করতে হয়। অফিসের কাজ তো শুধু কলম দিয়ে ফাইল ঘাঁটা। তাতেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এটা শুধু ভাবলেই চলে না, কবিত্ব ও থাকতে হয়। কবিত্ব যার তার থাকে না। সেজন্যই পৃথিবীতে সৃষ্টিশীল মানুষের বড়ই অভাব। অন্তত সে তাই মনে করে। সে রাত দিন শুধু কবিতা লেখে কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন কবিতার বই বেরোয় নি। কবিতার বই তো দূরের কথা একখানা কবিতা ও আজ পর্যন্ত পেপারে ছাপা হয় নি। অবশ্য যারা কবিতা লিখে বই ছাপায় তাদেরকে সে মাঝে মাঝে ব্যবসায়ী ও মনে করে। তবে তাঁর কবি হওয়ার শখ। কবিত্বকে নিয়ে আসবই – এই তাঁর সংকল্প। কবি মনে করে 'একবার

না পারিলে দেখ শতবার' আর 'ইচ্ছা থাকিলে উপায় হয়' – এই দুটি বাক্যই ওকে কবি বানিয়ে দেবে। তার ইচ্ছা আছে কবি হওয়ার তাই সে একটা উপায় বের করবেই আর শতবার কেন, সে সহস্রবার চেষ্টা করবে। তবে সে খুনটা আজকেই করবে। কবি হওয়ার পথে সে কোন বাধা রাখবে না।

নাস্তা খাওয়ার জন্য কবি টেবিলে বসল। টুপ টুপ করে পানি পড়ার হার বেড়েছে। ওদিকে তার খেয়াল নেই। প্লেটে ভাত নিয়ে সে খাওয়া শুরু করল। অর্ধেক খাওয়া হয়েছে এমন সময় তার পা ভিজে গেল। সে বুঝল, বালতি ভরে গিয়েছে। মিস্ত্রীর উপর তার খুব রাগ হল। উঠে গিয়ে সে বালতির পানি ফেলে দিয়ে আবার আগের জায়গায় পেতে রাখল। সে আর ভাত খেল না। বেসিনে হাত ধুয়ে কবি শোবার ঘরে চলে গেল। খাটে শুয়ে সে কীভাবে খুন করবে তা পরিকল্পনা করতে শুরু করল। একে তো খুন করা তার পেশা নয়,তার উপর যাকে খুন করবে তাকে সে অনেক ভালোবাসে। তাকে এমনভাবে খুন করবে যাতে সে সর্বনিম্ন কষ্ট পেয়ে মারা যায়। কিন্তু কি সে পদ্ধতি তা তার জানা নেই। অবশেষে অনেক ভেবে সে সিদ্ধান্ত নিল গলা টিপে খুন করবে। শিকার তার কাছে তার দরজা দিয়েই আসবে। তখনই সে খুন করবে।

তার সামনে তিনটা বড় বড় তাক আছে। তিনটি তাকই বইয়ে ভরা। প্রথম দুইটি আলাদা আলাদাভাবে সাহিত্যের বই দিয়ে আর অন্যান্য বই নিয়ে তৃতীয়টি সাজানো। এইগুলি তার সব পড়া হয়ে গেছে। বইগুলির দিকে তাকিয়ে সে নিজেকে আরেকবার সাহস জোগাল। এমন সময় কলিংবেল বাজল। হাতজোড়া ঠিক করে নিয়ে কবি দরজা খুলতে গেল।

দরজা খুলতেই সে এক অপরিচিত বিশ– বাইশ বছরের যুবককে দেখল। শ্যামলা, গড়নে ছোট। হালকা গোঁফ। কবি এমনিতে ও অস্থিরতায় ভুগছিল তার উপর এই ছেলেটিকে দেখে কবির মেজাজ গেল বিগড়ে।

"কি চাই ?" ধমক দিয়ে কবি বলল।

"জ্বি,পেপারের বিলের জন্য এসেছিলাম।" ছেলেটি উত্তর দিল।

"নাই, পরে নিও।"

"স্যার, আমি গত পরশু ও এসেছিলাম। আপনিই স্যার আজকে আসতে বলেছিলেন।"

"আমি আবার কখন বললাম। কই বলিনিতো। আচ্ছা, ঠিক আছে। হয়তো ভুলে গিয়েছি। আজ কয় তারিখ ?"

"৫তারিখ।"

"ঠিক আছে, বিকেলে এসো।"

"জী স্যার " বলে ছেলেটি চলে গেল। দরজা বন্ধ করে কবি আর শোবার ঘরে গেল না। সামান্য গরম লাগলেও ফ্যানটা না ছেড়ে সে সোফার উপর শুয়ে পড়ল। তার একটু একটু মনে পড়ছে। হ্যাঁ, সেই তো বলেছিল ছেলেটাকে আজকে আসার জন্য। ওর স্ত্রী এলেই

সে ওকে বলবে যেন বিকেলে ছেলেটাকে বিলটা দিয়ে দেয়। ও ওর স্ত্রীকে খুব ভালোবাসে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় প্রেম। কবির চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। তবে ক্লাসে ১ বছরের। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে ওরা কত নাটক, কত সিনেমা দেখেছে। লাইব্রেরিতে ও পড়তে যেত একসাথে। ফলে বোঝাপাড়াটাও হয়েছিল বেশ। আজ তাদের সংসার ১১ বছরের। একটিমাত্র মেয়ে। সবকিছুই হলো। সংসার হলো, গাড়ি হলো, বাড়ী হলো। শুধুই ওর কবি হয়ে ওঠা হলো না। কবি হওয়ার জন্য সে চাকরি পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে। তবে সে কবি হবেই। আর তার কবি হওয়ার পথে যে বা যারা তাকে বাঁধা দেবে তাদের সবাইকেই সে এক এক করে খুন করবে।

আবার কলিংবেল বেজে উঠল।

"কে" দরজা না খুলে ভেতর থেকে কবি জিজ্ঞেস করল।

"আমি" এক অপরিচিত কণ্ঠ উত্তর দিল।

"আমি মানে কি 'আমি' নাকি ? কে বলবেন তো ?"

"আমি পানির কলের মিস্ত্রি।"

কবি দরজা খুলল। মাঝারি গড়নের লুঙ্গি পড়া এক লোক দাঁড়ানো। সামান্য টাক। বয়সটা বোঝা যাচ্ছিলো না। সে তাকে ভিতরে ঢুকতে দিল। ঢুকেই মিস্ত্রি তার কাজে লেগে গেল। পানির কলের মিস্ত্রি যখন বেসিনটা ঠিক করছিল তখন বাড়িওয়ালার উপর কবির খুব রাগ হল। বেসিনটার কথা অনেকবার বলা হলেও বাড়িওয়ালা কিছুই করে নি। সে বড়িওয়ালা কে মানুষ হিসেবে গণ্য করে না। বেটা একটা বদ লোক। সংকীর্ণমনা। বাসার রান্নঘর, গোসলখানা অস্বাভাবিকভাবে ছোট। ছোট্ট গোসলখানার বিরাট অংশ আবার টয়লেট খেয়ে ফেলেছে। যে খাওয়া - দাওয়া এবং প্রাকৃতিক কাজকর্মকে ছোট করে দেখে সে ছোট লোক নয় তো কি ! কবির বিশ্বাস এই বাড়িওয়ালা কখনোই কবি হতে পারবেনা। কারণ কবিদের মন বিশাল। মহাসমুদ্রের মতো। আর এই বাড়িওয়ালার মন ছোট। সংকীর্ণ। ঠিক তার টয়লেটের মতো।

এর মধ্যেই মিস্ত্রি তার কাজ শেষ করল। মিস্ত্রি চলে গেল।

কবি আবার ও একা হয়ে পড়ল। সে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে শুরু করল। জীবনের মুহূর্তগুলোকে সে মেলাতে চেষ্টা করছিল। বাবা – মা আর ছোট বোন গ্রামে থাকে। তাদের আসতে বললেও তারা আসে নি। তাই বউ আর মেয়েকে নিয়ে তার একার সংসার। সংসারটা তার বউ একাই সামলাচ্ছে। কবিও তার বউকে অনেক ভালোভাসে। বিশাল সমুদ্রের ভাসমান ছোট্ট নৌকা যেমন সমুদ্রের যে অংশেই থাক না কেন সমুদ্র থেকে কখনো হারায় না। ঠিক তেমনি কবির বউ ও একটি মূহুর্তের জন্যও কবির মন থেকে হারিয়ে যান না। লোকে বলে সন্তান জন্মনোর পর নাকি স্বামীর ভালোবাসা স্ত্রী থেকে সরে গিয়ে সন্তানের উপর পরিবাহিত হয়। কিন্তু কবির কোন পরিবর্তন নেই। সে শুধুই তার স্ত্রীকে ভালোবাসে। আর মেয়েটাকে মনে করে আপদ। মেয়ে বলে নয়। ও আসলে

সন্তান ই নিতে চায় নি। আর মেয়েরা যেমন ওর স্ত্রীও তেমন। সন্তান ছাড়া থাকতেই পারবেনা। কবির আশংকা ছিল হয়তোবা তার ভালোবাসা কমে যাবে। কিন্তু কমে নি। আর এই ভালোবাসাই ওর জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অতিরিক্ত ভালোবাসার জন্যই সে কবিতা লিখতে পারে না বলে কবি মনে করে। কারণ তার মনের সমুদ্রে শুধু তার স্ত্রীর ছবি ভেসে উঠে, কবিতা ভাসে না। কিন্তু ওকে যে কবি হতে হবে। একমাত্র কবিত্বই ওকে শান্তি দিতে পারে। এজন্যই সে আজকে তার বউকে খুন করবে। স্ত্রীর অস্তিত্ব না থাকলে কবির ভালোবাসা থাকবে কি করে ! কবির বিশ্বাস শারীরিক অস্তিত্ব না থাকলেই মানসিক অস্তিত্ব থাকবে না। এসব ভাবতে ভাবতে কবি নিজের অজান্তে সোফায় ঘুমিয়ে পড়ল।

কবির ঘুম ভাংলো অবিরত কলিংবেলের শব্দে। হুঁশ ফিরতেই কবি নিশ্চিত হল ওর স্ত্রী এসেছে। কবি প্রস্তুত। সে দরজা খুলল।

কবির স্ত্রী ফিরে এসেছে। এক হাতে ঔষধের বোতল আর আরেক হাতে কবির প্রিয় ক্যামেরাটি। ক্যামেরাটি অনেকদিন থেকেই নষ্ট ছিল। কবির খুব কাছের এবং খুব প্রিয় একটি জিনিস। সে খুব খুশি হল এই ভেবে যে তার স্ত্রী তাকে ভালবেসে তার প্রিয় ক্যামেরাটি সার্ভিসিং করে দিয়েছে। সে ভুলতেই বসেছিল তার প্রিয় ক্যামেরার কথা। সে নিশ্চিত হল তার স্ত্রী ও তাকে ভালবাসে। ঔষধের বোতলটি দেখে সে মোটেও খুশি হল না। সে জানে তাকে প্রতিদিন সেই বোতল থেকে সকাল বিকাল দুইবেলা ঔষধ খাইতে হয়। সবাই ওকে বলে নিয়মিত ঔষধ খেলে নাকি তার পাগলামি বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু সে জানে কবিরা প্রকৃতিগতভাবেই পাগল, শারীরিক পাগল নয়।

কবির স্ত্রী শোবার ঘরে ঢুকেই পুরো ব্যাপারটা আঁচ করতে পারল। বিছানাপত্র এলোমেলো। বইয়ের তাকগুলো খোলা এবং নিচে যত্রতত্র বই ছড়ানো ছিটানো। এটা তার কাছে নতুন নয়। সে তৎক্ষণাৎ রান্নাঘরে গেল। সেখানে ও একই অবস্থা। আগের মতই একটা লোহার রড আর একটা ছুরি ড্রইং রুমের সেলাই মেশিনের উপর রাখা। পুরো ঘরে সে চোখ বুলিয়ে নিল। এবারে একটু বেশীই মনে হচ্ছে। সে আবার শোবার রুমে ঢুকে সবকিছু ভাঁজ করা শুরু করল। ভাঁজ করার সময় সে একটা কাগজ পেল। সে অক্ষর দেখে বুঝতে পারল তার স্বামীর লেখা এবং সেখানে লেখা "লক্ষী বউ আমার, আমাকে ক্ষমা করে দিও। আজকে তোমাকে খুন করব। আমাকে কবি হতে হবে।"

এটা একেবারে নতুন। চার পাঁচ বছর হল তার স্বামী পাগল হয়ে গেছে। নিয়মিত পাগলামি করলেও কখনো এরকম চিরকুট সে পায় নি।

নোবেলজয়ীদের কবিতা

'নোবেলজয়ীদের কবিতা' বাঙলায়ন করেছেন রহমান হেনরি দাদা। 'অগ্রদূত' থেকে প্রকাশিত হয়েছে ২০১৪ এবারের মেলার শেষ দিকে। অগ্রদূতের এই উদ্যেগ বেশ ভালো লেগেছে। হেনরি ভাইয়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমিও দু-একটা চাকমায়ন করতে শুরু করেছি। বাংলা এবং ইংরেজি দইু ভাষাতে থাকাতে বেশ সুবিধে হয়েছে অনুবাদে।

Octavio Paz Lozano # ১৯৯০ সালে সাহিত্য নোবেলজয়ী

হারে ফেলে হন্না

ইরুক ইদু ইক্কোও;
গাচ্ছুনোর মনদও ইক্কোও
গায় গায় আত্মা নেই আর।
সেক্কে মুই
হবর নপাং হুদু জিয়োংগোই
গায় গায়
বানা গায় গায়।

Where Without Whom
There is not
A single soul among the trees
And I
Don't know where I've gone.

Nelly Sachs- ১৯৬৬ সালে নোবেলজয়ী
মোনমুরোগুন

মোনমুরোগুনে
চুমাচুমি গুরিবাক
যেক্কেন্নে আমা মানুষউন-
তাঁরা বেড়চাগা ঘরত্তুন নিগিলিনেই;
আর একসাদিয়ে এই হাবাহাবি পিথিমিত্তুন
সাতরঙর বানিয়ে রানজুনিত্তুন
মুকুট বানেবাক
একজনরলাই আরেকজনর মাদাত।

The Mountain Tops
The mountain- tops
Will kiss each other
When people leave their huts of death
And crown each other
With rainbows
The seven-coloured solace
Of the haemorrhaging Earth-

Savatore Quasimodo
১৯৫৯ সালে কবিতার জন্য নোবেলজয়ী
Suddenly It's evening
Everyone is alone at the heart of the earth
Pierced by a ray of sunshine;
And suddenly it's evening.

আদিক্কে বিলে
বেলছদগর বোর্জিত গাদা হেলে
পিথিমির বেক মানুষউন গায় গায় অন
আর সেক্কেন্নে আদিক্কে বিল্লে'র আন্ধার লামি এজে।

Saint- John Perse
১৯৬০ সালে নোবেলজয়ী

The Seed
You buried it in a flowerpot, the purple seed that had stuck to
Your goatskin jacket
It has not sprouted.

বিজ

এক্কানা গুরি মুরত পুরি ভাবি সা
রাঙা যে বিজ;
তুই ত ছাগলঅচামড়ালোই বানিয়ে
জ্যাকেদত ঢুস হাবিয়োস;

তে আর জনম ন লল।

চাকমায়ন- আলোড়ন খীসা

পাঠক প্রতিক্রিয়া : চেতনার এনজিওকরণ

অডং চাকমা

হুচ-এ 'চেতনার এনজিওকরণ' শিরোনামে পাইচিমং মারমা'র একটি লেখা চোখে পড়ল। তাঁর আলোচনা থেকে মনে হয়েছে, তিনি এনজিওদের উপর ক্ষুব্ধ। কেননা, তাঁর মতে জুম্ম সমাজে বিশেষ করে যুব সমাজে যে রাজনৈতিক বিমুখতা ও মূল্যবোধহীনতা বিরাজ করছে, অর্থাৎ ছাত্র-যুব সমাজের অংশগ্রহণে যে বড় ধরনের কোন আন্দোলন ঘটছে না, তার পেছনে এনজিওদের ভূমিকা রয়েছে। আন্দোলনে ভূমিকা রাখার পরিবর্তে এনজিওরা 'সমাজ মননে' অন্যরকম পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। এককথায়, তিনি বর্তমান জুম্ম সমাজের প্রেক্ষাপটে এনজিওর ভূমিকাকে ক্ষতিকর হিসেবে বিবেচনা করছেন। তাঁর এই তত্ত্ব বা অবস্থানের সপক্ষে তাঁর লেখায় গভীর বিশ্লেষণ দেখতে পাইনি। ভাসাভাসা বা বিক্ষিপ্তভাবে কিছু ইস্যু তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে লেখককে ধন্যবাদ জানাই সমাজ ও এনজিও সংক্রান্ত আলোচনায় চিন্তার খোরাক জোগানোর জন্যে।

পাহাড়ের সন্তান হিসেবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বিষয়ে কিছু অধ্যয়ন করার ও কিছু ছোটখাটো গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুবাদে আমার যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান হয়েছে, সে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে আমি 'চেতনার এনজিওকরণ' লেখকের উত্থাপিত কিছু বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস পাচ্ছি। মনে পড়ছে, লেখকের সাথে এর আগেও ফেসবুকে এ ব্যাপারে বিতর্ক হয়েছিলো।

এনজিও প্রসঙ্গে লেখকের ধারণা ও কিছু উত্তরহীন প্রশ্ন :

লেখাটা পড়ে মনে হয়েছে, লেখকের এনজিওর প্রতি এক ধরনের নেতিবাচক ধারণা বা prejudiced view আছে। সঙ্গতকারণে তাঁর লেখাতে এনজিওর 'কালো' দিকগুলো ফুটে উঠেছে, কিন্তু 'আলো'র ব্যাপারে কোন বক্তব্য নেই। এনজিও বিষয়ে লেখকের অবস্থান বা বক্তব্য হলো,

"এনজিওতে চাকরি করার ফলে সমাজে একটা সমাজ মনন গড়ে উঠে যা আমাদের জুম্ম সমাজে যেখানে আমরা অস্তিত্বের লড়াইয়ে লড়ছি তার ক্ষতি হয়"।

লেখকের এ বক্তব্যে মূল প্রত্যয় বা চলকগুলো হলো "এনজিও", "সমাজ মনন" আর "জুম্মদের অস্তিত্বের লড়াই"।

প্রথমে, এনজিও নিয়ে আলোচনা করা যাক। বর্তমান উন্নয়ন আলোচনা ও পরিকল্পনায় "এনজিও" একটি বহু অর্থবোধক প্রত্যয় এবং বিতর্কিতও বটে। লেখক তাঁর লেখাতে "এনজিও" বলতে কাদেরকে বুঝিয়েছেন সেটা স্পষ্ট করেননি। শাব্দিক অর্থে যেসব সংগঠন সরকারের অংশ নয়, তারাই এনজিও। সেই অর্থে যারা রাজনৈতিক সংগঠন

করছে, সমিতি করে, ক্লাব করে এবং ধর্মীয় মিশন তাঁরাও এনজিওবর্গের মধ্যে পড়ে। আবার স্থান ও কার্যপরিধিভেদে এনজিও'র রকমভেদ আছে। যেমন, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও। আবার এনজিও'র কার্যক্ষেত্র অনুসারেও রকমভেদ আছে। পরিবেশবাদী এনজিও, মানবাধিকার বিষয়ক এনজিও, নীতি গবেষণা ও সংলাপ বিষয়ক এনজিও (যেমন বাংলাদেশের থিংক ট্যাংক প্রতিষ্ঠান সিপিডি), সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক এনজিও ইত্যাদি। এনজিও'র বিবর্তন ও ভূমিকা অনুসারেও এনজিও'দের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। আগে উন্নয়নশাস্ত্রে এনজিও বলতে কোন শব্দ ছিলো না। সেই এনজিও'র ধারণা কীভাবে হলো, বিকাশ কীভাবে হলো? এই শুরু থেকে বিকাশ এই যাত্রাপথে পার্বত্য চট্টগ্রামে এনজিও'দের অবস্থান কোথায়? উন্নয়ন ধারণা পরিবর্তনের সাথে সাথে এনজিও'র ভূমিকা ও ধারা বদলেছে। এনজিও'র বিবর্তনের পর্যায়কে কয়েকটা ধাপে ভাগ ভাগ করা যায়। শুরুতে এনজিও'র ভূমিকা ছিলো ত্রাণ ও কল্যাণ-এর (Relief and welfare) মধ্যে। তারপর অনেক উন্নয়ন ধারণা (development concepts) এসেছে। সমাজ উন্নয়ন (community development), তারপর টেকসই উন্নয়নের জন্যে কাঠামোতে পরিবর্তন (structural change for sustainable development) এবং সর্বশেষ জনগণ আন্দোলন (peoples movement)। উদাহরণ হিসেবে বলি, ব্র্যাকের জন্ম ত্রাণ ও কল্যাণমূলক কাজের মধ্য দিয়ে। তারপর সে ধারণা থেকে চলে গেছে সমাজ উন্নয়ন কনসেপ্টে। ব্র্যাক বা বাংলাদেশের এনজিও'রা 'জনগণ আন্দোলন' পর্যায়ে যায়নি। এন-জিও'রা সমাজ বাস্তবতার বাইরে নয়। সমাজ বাস্তবতার আলোকে এনজিও'র ভূমিকা নির্ধারণ হবে। তবে এনজিও'তেও সবাই ভালো সেটা নয়। রাজনীতিতে যেমন ডান, বাম, মৌলবাদ ইত্যাদি আছে, ঠিক তেমনিভাবে এনজিও সেক্টরেও চোর বাটপার থেকে শুরু করে ধর্মব্যবসায়ী সমাজকর্মী ও ধন ব্যবসায়ীরাও আছে। যেমন, বিশ্বব্যাংক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের সাথে যেসব এনজিও জড়িত ছিলো তাদের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। গবেষণাভুক্ত এনজিওদের ভূমিকা অনুসারে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে Ben-eficiaries, Mercenary, Missionary, এবং Revolutionary (Carmen Malena, 2000, IDS Bulletin Vol. 31, No 3). শব্দগুলো দেখে বুঝতে পারছেন, এনজিও'রা উপকারভোগী হিসেবে যেমন দায়িত্ব পালন করতে পারে, অর্থের বিনিময়ে ভাড়াটে হিসেবেও কাজ করতে পারে, আবার বিপ্লবী ভূমিকাও পালন করতে পারে। এখন প্রশ্ন হলো, এসব এনজিও'র পেছনে কারা? কোন উন্নয়ন দর্শনে তারা বিশ্বাস করে?এখন আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন রাখতে চাইঃ জুম্মদের উন্নয়নদর্শন কী? উন্নয়নকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষে চালিত করার জন্যে আমাদের সমন্বয়কারী শক্তি বা প্রতিষ্ঠান(গুলো) কে বা কারা আছে? তাঁদের নেতৃত্ব যোগ্যতা কী আছে? আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে যেসব এনজিও কাজ করছে তাদেরকে কীভাবে ভাগ করেছেন? তাঁরা কোন উন্নয়নদর্শন বা কনসেপ্টে কাজ করছে এবং তারা কোন ভূমিকা (Beneficiaries? Mer-

cenary? Missionary? Revolutionary?) পালন করছে সে ব্যাপারে আপনার কোন সুনির্দিষ্ট গবেষণা বা মূল্যায়ন আছে কী? আরো অনেক প্রশ্ন করা যায়। এনজিও সংক্রান্ত আলোচনা করতে গেলে এসব প্রশ্নের মীমাংসা না করে "এনজিও" বর্গে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত সবাইকে একই দোষে দোষী সাব্যস্ত করেন তাহলে সেটা যুক্তিসংগত হতে পারে না।

এখন, 'সমাজ মনন' প্রসঙ্গে যাই। আপনার অভিযোগ, এনজিও'তে চাকরি করার ফলে এক ধরনের 'সমাজ মনন' গড়ে উঠে এবং সেটা আমাদের অস্তিত্ব লড়াইয়ে ক্ষতিকর। কিসের ভিত্তিতে আপনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন? আর 'সমাজ মনন' বলতে কী বুঝাতে চাচ্ছেন? 'সমাজ মনন'-এর ব্যাপারে একটু ব্যাখ্যা দিলে এনজিও'র চাকরীর সাথে এর যোগসূত্রতা কী তা বুঝা যেতো। অবশ্য আপনি একজন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রের উদাহরণ দিয়ে "সমাজ মনন" সম্পর্কে একটু বলার চেষ্টা করেছেন। আপনার উদ্ধৃতি দিচ্ছি,

"একজন ঢাবির জুম্ম সামাজিক দায়বোধ থেকে লিখতে চায় না। সে এনজিও'র incentive নিয়ে লিখতে আগ্রহী"।

একজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের "সামাজিক দায়বোধ" কী কেবল এনজিও'র incentive দ্বারা প্রভাবিত? তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম এনজিও'রা incentive সৃষ্টি করেছে। এই incentive-এর সাথে "সামাজিক দায়বোধ" থেকে লেখার মধ্যে সরাসরি নেতিবাচক সম্পর্কটা বুঝলাম না। এটা কার সমস্যা এনজিওর নাকি ঐ ছাত্রের? ব্যাপারটা অনেকটা এরকম মনে হচ্ছে, "যার জন্য করি চুরি, সে বলে চোর"। আমি মনে করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচ্ছিন্ন একজন ছাত্রের উদাহরণ টেনে পুরো এনজিও সমাজের ব্যাপারে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বিজ্ঞানসম্মত নয়।

এবার তৃতীয় প্রসঙ্গে যাই "জুম্মদের অস্তিত্বের লড়াই"। এখানে বেশি বলার নেই। লেখাটা পড়ে মনে হয়েছে, লেখক এখানেও এনজিও'দের দায়ী করেছেন। তাঁর ভাষ্যমতে এত সংকটের মধ্যেও জুম্মদের অস্তিত্ব লড়াইয়ে বড় ধরনের কোন আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে উঠছে না। কারণ, ছাত্র-যুব সমাজের মধ্যে রাজনীতি বিমুখতা কাজ করছে। এর পেছনের কারণও এনজিও চাকরি। শিক্ষিত স্নাতকরা এনজিও'তে ঢুকছে। এনজিও'রা মেধা কিনে নিয়েছে। লেখকের ভাষায়-

"একদিকে অস্তিত্বরক্ষার জঙ্গি লড়াই যেমন গড়ে উঠছে না, অন্যদিকে শিক্ষিত অংশের মগজ কিনে নিয়ে নিয়েছে এনজিওগুলো। ফলে এসব ইস্যুতে যা হচ্ছে তা হল গোলটেবিল বৈঠক, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম"।

তাত্ত্বিক ভাষায় বললে তিনি যা বলতে চেয়েছেন সেটা হলো, জুম্মদের জঙ্গি লড়াই গড়ে তোলার জন্যে 'বিষয়গত বা বস্তুগত শর্ত' বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও 'বিষয়ীগত শর্ত' পূরণে এনজিও'রা বাধা হিসেবে কাজ করছে। কারণ, তারা আন্দোলনের প্রাণশক্তি যুব সমাজকে অন্যপথে নিয়ে যাচ্ছে। এ বক্তব্যের মধ্যে আপাত সত্যটা থাকলেও খুব বেশি বস্তুগত

ভিত্তি নেই। জুম্ম সমাজ থেকে প্রতিবছর যে সংখ্যক গ্র্যাজুয়েট বের হচ্ছে, তার কত অংশ এনজিও'তে যাচ্ছে? শিক্ষিত "মগজগুলো" এনজিও'তে না গেলে "জঙ্গি লড়াই"-এ সামিল হতো তার কতটুকু গ্যারান্টি ছিলো বা আছে? বরং এ ধরনের বক্তব্যের মধ্যে এক ধরনের দুরভিসন্ধি আছে। অর্থাৎ শিক্ষিত যুবকরা বেকার থাকলে, বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে আজকের ত্রিধাবিভক্ত জুম্ম রাজনৈতিকদলগুলো জঙ্গি লড়াই-এর নামে তাদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সুযোগ পেতো। বাস্তবেও জেএসএস-ইউপিডিএফ'এর রাজনীতিতে তাই দেখতে পাচ্ছি। দেখেছি, অনেক প্রতিভাবান ও সম্ভাবনাময়ী ছাত্র ছিলেন, যারা অনেক স্বপ্ন নিয়ে, আন্দোলন করার প্রত্যয় নিয়ে উভয় দলের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের স্বপ্নের বলি হলো কীভাবে? আজকে তাদের অনেকের পরিণতি কী হয়েছে তা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। হতাশাগ্রস্ত হয়ে তাদের অনেকে আজ জেএসএস-এও নেই, ইউপিডিএফ-এও নেই। যাদের যোগ্যতা আছে, তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় ঢুকে গেছে। অবশ্যই এখানে স্বীকার করতে হবে, জেএসএস-ইউপিডিএফ থেকে বের আসা যেসব যুবকদের বড় অংশ এনজিও চাকরিতে ঢুকেছে। কারণ, বর্তমান দুর্নীতির রাজ্যে সরকারি চাকরি পাওয়া কঠিন। সে যাই হোক, জুম্ম যুব সমাজে কেন রাজনীতিবিমুখতা কাজ করছে সে ব্যাপারে গবেষণা হতে পারে। তখন ধারণা পাওয়া যেতে পারে সমস্যার গভীরতা সম্পর্কে। লেখকের একদেশদর্শী ব্যাখ্যার সাথে একমত নই। জোর দিয়ে এনজিও'র চাকরিকে জুম্ম সমাজে রাজনীতি বিমুখতার জন্যে দায়ী করাকে যথাযথ নয় বলে মনে করি।

অরুন্ধতী রায়ের বক্তব্য প্রসঙ্গে :

লেখক ভারতের প্রখ্যাত লেখিকা ও মানবাধিকার কর্মী অরুন্ধতী রায়ের কথা এনেছেন খুব সুন্দরভাবে। অরুন্ধতী রায়ের বক্তব্যের সারমর্ম হলো, এনজিও'রা সাহায্য বা টাকা পয়সা দিয়ে গরীব দুঃখী মানুষকে খেয়ে-পড়ে বাঁচিয়ে রাখে। এর মাধ্যমে তারা জনগণের রাজনৈতিক ক্রোধকে প্রশমিত করে রাখে। অর্থাৎ সরকার ও জনগণের মধ্যে একধরনের প্রতিরোধ দেয়াল বা buffer তৈরি করে রাখে। ফলে নিপীড়ক রাষ্ট্র বা পুঁজিবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে শক্ত আন্দোলন গড়ে উঠে না। বিভিন্ন আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বা চাকরি-বাকরি পেয়ে যুব সমাজও শান্ত থাকে। অরুন্ধতী রায়ের এসব বক্তব্যে একেবারে সত্যতা নেই তা নয়। সত্যতা আছে। এখানে দেখতে হবে কে কোন রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাস করে। অন্যভাবে বললে, কে কোন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিষয়গুলোকে দেখেন। যেমন, পানির গ্লাসের উদাহরণ নেওয়া যায়? গ্লাসটি অর্ধেক পূর্ণ নাকি অর্ধেক খালি? কেউ প্রথমটা বলতে পারে, আবার কেউ দ্বিতীয়টা বলতে পারে। অরুন্ধতী রায় "খালি" থাকার কথাটা বলছেন।

অরুন্ধতী রায়ের বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে গেলে উন্নয়ন তাত্ত্বিকদের কথাও আনতে হয়। উন্নয়ন তাত্ত্বিকরা দুই শিবিরে বিভক্ত। একদল তত্ত্ব দেয় 'উন্নয়নশীল বা তৃতীয় বিশ্বের"

উন্নয়ন ঘটাতে গেলে 'আধুনিকায়নের' পথ ধরে যেতে হবে। অর্থাৎ পশ্চিমারা যেভাবে উন্নয়নের পথে গেছে সেভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে যেতে হবে। এর মানে হলো, কৃষি থেকে শিল্পায়নের দিকে যেতে হবে। এককথায়, পুঁজিবাদের পথ ধরে উন্নয়ন হবে। এদেরকে বলা হচ্ছে Modernization theorists(MT). অন্যদিকে আরো একদল প্রশ্ন করছে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো কীভাবে 'আধুনিকায়নের পথ' ধরবে? পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর দারিদ্র্যে সুযোগ নিয়ে এমন নিয়মনীতি ও শর্তের জালে আবদ্ধ করে রাখে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো নিজের মত করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে সবসময় পুঁজিবাদী দেশগুলোর উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। এই নির্ভরশীলতার কারণে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো সবসময় দরিদ্র অবস্থা হতে উত্তরণ হতে পারছে না। এ মতের তাত্ত্বিকদের যারা, এদেরকে বলা হচ্ছে Dependency Theorists(DT). নির্ভরশীলতার তাত্ত্বিকরা (Dependency Theorists) মার্ক্সিস্ট। তাঁরা যুক্তি দেখান, পুঁজিবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো তাদের বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান যেমন বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও বিভিন্ন সাহায্য শর্তাবলীর মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বাজারব্যবস্থা বা পুঁজিবাদ সম্প্রসারণ করে থাকে। রাষ্ট্র বাদেও সাহায্য দেওয়ার বিভিন্ন মাধ্যম আছে। যেমন, ব্যক্তি বা বেসরকারি খাত। বেসরকারি খাতের মধ্যে অন্যতম হলো এনজিও। অনেক পুঁজিবাদী অনেকসময় দেশ তৃতীয় বিশ্বের অনেক সরকারের অদক্ষতা ও দুর্নীতির কারণে এনজিও বা বেসরকারি চ্যানেলে ফান্ড দিয়ে থাকে। সে ফান্ডের ধরণও বিভিন্ন হতে পারে কিছু অনুদান, কিছু ঋণ, কিছু শর্তহীন আর কিছু শর্তযুক্ত। এই অবস্থান থেকে অরুন্ধতী রায়ের মত Dependency Theorists-রা এনজিও'দের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করেন।

এখন প্রশ্ন হলো, এনজিও'রা এ জায়গায় কী ভূমিকা পালন করছে? বাজার বা পুঁজিবাদ সম্প্রসারণের জন্যে নাকি অন্য কিছু? সব সাহায্যকে আমরা কী নেতিবাচক হিসেবে দেখবো? কিংবা এনজিও'র ভূমিকাকেও সবসময় নেতিবাচক দিক থেকে বিশ্লেষণ করবো? এনজিও'র ভূমিকা নিয়ে রাজনীতিবিদদের মধ্যে যেমন বিতর্ক আছে, তেমনি একাডেমিকদের মধ্যেও আছে। নিচে লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্সের এক অধ্যাপক David Lewis-এর 'Management of Non-Government Organizations' বই থেকে একটা উদ্ধৃতি লক্ষণীয় :

"Indeed NGOs appeal to all sides of the political spectrum. For liberals, NGOs help to balance between state and business interest and prevent abuses of the power these sectors hold. For neo-liberals, NGOs are part of the private sector and provide vehicles for increasing market roles and advancing the course of privatization through private 'not-for-profit' action. Finally, for the left, NGOs promise a 'new politics', which offers the chance of social transformation, but presents an alternative to earlier radical strategies for capturing state power and centralization" (Clark 1998 in David, 2001, page 40).

(রাজনৈতিক অঙ্গনে সব মহলের কাছে অবশ্যই এনজিও'দের উপযোগিতা আছে। উদারনৈতিকরা মনে করে, এনজিও'রা রাষ্ট্র ও ব্যবসায়িক স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে এবং তাদের মধ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করতে সহায়তা করে। নয়া-উদারনৈতিকদের কাছে, এনজিও'রা 'অলাভজনক' কাজের মাধ্যমে বাজার ও ব্যক্তিখাতকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে। আর বামদের কাছে, এনজিও'রা 'নতুন রাজনীতির' সম্ভাবনা সূচনা করতে পারে, যার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের সুযোগ আছে, তবে তা অবশ্যই পূর্বের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল ও কেন্দ্রীকরণের কট্টর কৌশলের বিকল্প হিসেবে)

এখানে লক্ষ্য করুন, এখন কোন চশমা পরে এনজিওকে ব্যাখ্যা করবেন। অরুন্ধতী রায় বাম আদর্শের লোক। তিনি প্রথম দু'টো বিকল্প গ্রহণ করবেন না। বামদের জন্যে যে বিকল্প আছে, সেটা বিশ্বাস করেন কী না জানি না। পাইচিমং মারমা বা অন্য যারা পাহাড়ে 'প্রগতিশীল' রাজনীতি করেন বলে দাবী করেন, তারাও এনজিওর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সমাজ পরিবর্তনে কাজ করা যায় সেটা বিশ্বাস করেন কী না? যদি না করেন, তাহলে নিজেদের কোন বিকল্প প্রস্তাব আছে কী?

পার্বত্য চট্টগ্রামে এনজিও নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও এক ধরনের এলার্জি দেখি। এনজিও ব্যাপারে জেএসএস-ইউপিডিএফ উভয় দলই সন্দেহবাদী। তবে তাদের মনে রাখতে হবে, বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় জুম্ম সমাজেও এনজিও'র ভূমিকা থাকবে। এখানেও অবশ্যই বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ প্রয়োজন। খণ্ডিত আলোচনা নয়, সেক্টরভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে সামগ্রিক আলোচনা পর্যালোচনা ও গবেষণা প্রয়োজন। সেটা করতে গেলে অবশ্যই আগে থেকে prejudiced view থাকা উচিত নয়। না হলে পুরো সত্য উদঘাটনে সহায়ক হবে না।

ধন্যবাদ পাইচিমং মারমাকে, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে আনার জন্যে। আশা করি, অন্যরাও আলোচনায় অংশ নেবেন।